হলুদে-সবুজে

অরুণ আইন

প্রকাশক :
এন. সাহা
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রকাশ : ২ শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রচ্ছদ :
নারায়ণ দেবনাথ

মুদ্রক :
শ্রীসনাতন সাঁতরা
দি সারদা প্রিণ্টার্স
১৫, কানাই ধর লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

উৎসর্গ

শ্রীচরণেষু মা—

॥ এক ॥

ওঁরা বলে গেছিলেন, আজ সকাল দশটা নাগাদ আসবেন। আমি যেন তৈরী থাকি। আমার বাবা যেন বাড়ি থাকেন।

আমার নিজের সাহসে কুলায়নি বাবাকে বাড়িতে থাকার জন্য বলতে। কাল রাতে মাকে দিয়ে বলিয়েছিলাম। বাবা তাই আজ কাজে যাননি, ঘরে আছেন। বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

বাবা কাজে না গিয়ে ঘরে আছেন এবং সেটা আমার খেলার ব্যাপারে কিছু লোক কথা বলতে আসবেন এইজন্য, এটা আগে ভাবা যেত না। কিন্তু ১৬ই জানুয়ারির ঐ খেলাটার পর বাবা আজকাল আমার দিকে একটু অন্যরকমভাবে তাকান। আমাকে বাড়িতে দেখলেই বাবা আর আজকাল আগের মতো তেড়ে মারতে আসছেন না। এবং বাবা ঘুমিয়ে পড়ার পর রাত ১১টায় আমি যে বাড়ি ঢুকতাম ইদানীং সেটা আর করতে হচ্ছে না। আমি সন্ধ্যেবেলায়ই প্র্যাকটিশ সেরে বাড়ি ফিরি। বাবা তক্তপোশে বসে থাকেন, আমি মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকে পড়ি। বাবা আর এখন কিছু বলছেন না। ১৬ তারিখের ঐ খেলাটার পর থেকে বাবার এই পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করছি। বোধহয় রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে কিছু শুনেছেন।

কিন্তু তা'বলে বাবার কাছে এতটা আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায়। কলকাতার কে না কারা আমার খেলার ব্যাপারে কথা বলতে আসবেন তার জন্য তাঁকে কাজ কামাই করে ঘরে বসে থাকতে হবে! বাবা কলকাতার একটা প্রেসে কাজ করেন। মাইনে পান সর্বসাকুল্যে ২১০ টাকা। একদিন কাজে না গেলে মাইনে থেকে ৭ টাকা কাটা যাবে। অথচ বাড়িতে পুষ্যি একজন-দু'জন নয়, আমরা আটজন। বাবা মা আর আমরা ছয় ভাইবোন।

তাই মা কাল রাতে যখন বাবাকে এই বাড়িতে থাকার প্রস্তাবটা

করেন, বাবা স্বভাবতই আপত্তি করেছেন। একটু তির্যক গলায় বলেছেন, হ্যাঁ, আজকাল রাস্তাঘাটে তোমার ছেলের খুব নাম শুনতে পাই বটে। তা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ালে চিরকালই রাস্তার লোক প্রশংসা করে। কিন্তু ওর খেলার ব্যাপারে কলকাতা থেকে কে কথা বলতে আসবে তার জন্য আমার কাজে কামাই দিলে মানেটা কী দাঁড়ায় জানো? পরের মাসে মাইনে থেকে সাত টাকা কাটা। তখন সংসারটা চলবে কি করে শুনি? তোমার ঐ গুণধর ছেলে টাকা উপার্জন করে এনে তোমাকে খাওয়াবে?

মা মৃদু গলায় বলেছেন, আহা, ছেলেটা যখন বলছে, তখন থাকই না একদিন। তুমি তো ওর খেলার ব্যাপারে কোনোদিন থাকনি। এবার বলছে, কলকাতা থেকে কারা নাকি সব গণ্যিমান্যি লোক আসবে তোমার সঙ্গে—

বাবা মাকে থামিয়ে দিয়েছেন—হুঁঃ, গণিমান্যি লোক!

মা মৃদু হেসে বলেছেন, তুমি চিন্তা কোরো না। এ মাসে না হয় আমি আর উমা রাত জেগে কয় শো ঠোঙা বেশী বানাব। তাতে তোমার সাত টাকার শোক ভুলতে পারবে।

বাবা এর পরও গজগজ করেছেন। অবশ্য বাবা আজ কাজেও যাননি।

বাবা এখন ওঘরে বসে আছেন। ডান পা মুড়ে তার উপর বাঁ পা ঝুলিয়ে। পরনে একখানা ছেঁড়া লুঙ্গি। বাবার ঐ একখানাই লুঙ্গি। খালি পা। বিড়ি খাচ্ছেন, বিড়ির টানে টানে বাবার রোগা হাড় বের করা পাঁজর হাপরের মতো উঠছে-নামছে। আমার খুব লজ্জা করল। আমি ভাবলাম, বাবা তাঁর পাঞ্জাবিটা আজ অন্তত পরলে পারতেন। কিন্তু বাবাকে ওকথা বলার সাহস আমার নেই। স্বয়ং মা কালীও যদি বাবার সঙ্গে গল্প করার জন্য আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন, তবু বাবা জামা গায়ে দেবেন না। বাবা বাড়িতে কখনো জামা গায়ে দেন না। একদিন বাবার প্রেসে গেছিলাম

একটা কাজে। দেখেছি, সেখানেও বাবা জামা খুলে টুলে বসে টাইপ গাঁথছেন।

দীপা এসেছে কিছুক্ষণ আগে। রান্নাঘরের চৌকাঠের বাইরে পিঁড়ি পেতে বসে মায়ের সঙ্গে গল্প করছে। নিশ্চয়ই আজকের খবর জেনেই এসেছে। ওকে কিন্তু আমি খবর দিইনি। অথচ, ওকে বলা উচিত ছিল আমার। লজ্জা করছিল। বোধহয়, ঝণ্টু কাল রাতে গিয়ে বলে এসেছে। দীপা বোধহয় আমার উপর একটু রাগ করেছে, আমার দিকে তাকাচ্ছে না। মায়ের সঙ্গেই গল্প করছে। উঃ, মেয়েদের যে কত কথাই থাকে বলার!

ঝণ্টু সেই সকাল থেকে পাড়ার মোড়ে ঘোরাঘুরি করছে। শুধু দীপাকেই নয়, ও বোধহয় পাড়ার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এসেছে। এখন ও পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওঁদের আসার জন্য অপেক্ষা করছে। ওঁরা এলে ও পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে। কোনো দরকার ছিল না, আমি মানা করেছিলাম। গণেশদাই সঙ্গে থাকবে। কিন্তু ওর উৎসাহ সবচেয়ে বেশী। দাদার খেলাধূলার ব্যাপারে ওর দারুণ গর্ব। গণেশদা ওকে বলে, ও নাকি আমার ফার্স্ট লেফ্‌টেনাণ্ট। অথচ ঝণ্টু……উঃ, ভগবান!

ঝণ্টুর ছোটবেলায় পোলিও হয়েছিল। ডান পাটা স্ক্রুর মতো পেঁচানো ওর। খুঁড়িয়ে হাঁটে। ও খেলতে পারে না। আমার কি কোনোদিন সুযোগ হবে না, ক্ষমতা হবে না ঝণ্টুর চিকিৎসা করার? শুনেছি, পয়সা খরচ করলে ঝণ্টু ভালো হতে পারে। অপারেশন করলে নাকি পাটা ওর সোজা হতে পারে। কিন্তু পয়সা …হ্যাঁ, শুধু পয়সা। এই পয়সার জন্য কত সাধ, কত স্বপ্ন আটকে যায়।

আমি বার বার চা খেতে ভালবাসি, মা জানেন। আমি বাড়ি থাকলে মা বাবাকে লুকিয়ে আমাকে দু-তিনবার চা দেন। মা রান্নাঘরে বসে এক কাপ চা করে দীপাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

দীপা চা নিয়ে এলো। আমি জানি, দীপা আমার উপর রেগে আছে। আমার সঙ্গে কোনো কথা বলল না। চৌকির ওপর ঠকাস করে কাপটা রেখে চলে যাচ্ছিল।

দীপাকে একটু রাগাতে ইচ্ছে হ'লো। বললাম, বি. এ. পাস করে তোমার খুব অহঙ্কার হয়েছে দীপা।

দীপা ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলল। ওর লম্বা ফর্সা ছিপছিপে চেহারায় একটা তেজ আছে। বলল, তাও তো বি. এ. পাস করে অহঙ্কার হয়েছে। অনেকের তো কিছু না করেই হয় দেখেছি।

—দীপা, গুরুজনদের ঠেস দিয়ে কথা বললে কী হয় জানো?

—কী হয়?

—কালীঘাটের কুকুর হয়।

দীপা বলল, আর ভালো মেয়েদের পেছনে লাগলে কী হয় জানো?

আমি বললুম, কী হয়?

—দক্ষিণেশ্বরের বাঁদর হয়।

এর উত্তরে কী বলতে হয় বুঝতে পারলাম না। আমি চিরকাল কথাবার্তায় একটু অপটু। তার উপর আবার দীপা; আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেছি দেখে দীপা মিটমিট করে হাসতে লাগল। ব্যস্, আমি এইটুকুই চেয়েছিলাম।

দীপা ফের কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঝণ্টু দৌড়ে ঘরে ঢুকল—দাদা, ওঁরা এসে গেছেন! উঃ, কী মস্ত বড় একটা সাদা গাড়ি!

উত্তেজনায় বেচারার চোখ-মুখ ফেটে পড়ছে। দীপা রান্নাঘরে চলে গেল। খবরটুকু দিয়েই ঝণ্টু আবার চট করে বাইরে চলে গেল। বোধহয় ওঁদের পথ দেখিয়ে আনতে।

হঠাৎ আমার শরীরের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল। যাঁদের আসার অপেক্ষায় গত দু'দিন ধরে আমার রাতে ঘুম হচ্ছে না, একটা

চোরা উত্তেজনায় সমস্ত হাত-পা চনমন করছে, আজ এই চরম মুহূর্তে সেই তাঁরা যখন আমাদের বাড়ির দুয়ারে এসে পৌঁছালেন, তখন কোথা দিয়ে যেন কী হয়ে গেল! একটা অসহ্য কষ্ট আর ক্লান্তিতে আমার বুক মুচড়ে উঠতে লাগল।

আমি ঝুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। রক্তের ভেতর নড়াচড়া করছে কেউ। উঃ, কত সাধনা, কত কষ্টের পর পৌঁছতে হয় এইখানে! কত দিন, কত রাতের কষ্ট, কত ব্যর্থতা, কত দুঃখ, কত অপমান পার হয়ে, দু'হাতে সরিয়ে তারপর……

কিচ্ছু ভোলা যায় না। তুমি যত দূর যাবে, পিছনের দিনগুলি তোমায় তত বেশী করে আঁকড়ে ধরবে। স্মৃতি আর প্রতিশ্রুতি এসে আক্রমণ করে। আর ঠিক তখন মনে পড়ে……

॥ দুই ॥

কলকাতার কাছে নৈহাটীতে থাকতাম আমরা। গঙ্গার ধারে একটা খোলার বস্তিতে বাসা ছিল আমাদের। পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহে দেশ-বাড়ি ছিল আমাদের। দেশ ভাগের পর ১৯৬০ সালে আমরা এপারে চলে এসে এই নৈহাটীর বস্তিতে উঠি। আমি তখন খুব ছোট—মোটে দু'বছর বয়স তখন আমার। উমা মায়ের কোলে।

পরে মায়ের মুখে গল্প শুনেছি দেশ-বাড়ির। জমিদার না হলেও মোটামুটি খাওয়া-পরার সংস্থান ছিল আমাদের। কিছু জমি-জায়গা ছিল। বাবা পাশের গাঁয়ের জমিদারবাবুর খাজাঞ্চিখানায় ছোট নায়েব ছিলেন। মৈমনসিংহের টাউন ক্লাবের ফুটবলার ছিলেন বাবা। ব্যাকে খেলতেন। বেশ নাম-ডাক ছিল বাবার। একবার

পা ভেঙে বিছানায় পড়ে ছিলেন নয় মাস। কিন্তু অভাব কী তখনও বুঝিনি আমরা।

তারপর হঠাৎ কোথা থেকে কী হয়ে গেল। বাবাকে একবস্ত্রে আমাদের হাত ধরে এপারে এসে রাস্তায় দাঁড়াতে হ'লো। কী করবেন বাবা, তখন থই পাচ্ছেন না। নৈহাটীর এই বস্তি বাড়িতে মাসিক আঠারো টাকা ভাড়ায় উঠে এলেন। তারপর এক বন্ধুর পরামর্শে তিন মাসের মধ্যে প্রেসের কম্পোজিটারি বিদ্যা শিখে নিলেন। তারপর শিয়ালদার এক প্রেসে কাজ পেলেন মাসিক একশো চল্লিশ টাকা বেতনে।

আমাদের জ্ঞান হবার পর থেকে বাড়িতে দেখেছি শুধু অভাব আর দুঃখ, কষ্ট আর লাঞ্ছনা। বাবা বলতে চিনতাম, একজন রোগা হাড়-জিরজিরে লোককে, যিনি সব সময় রেগে থাকেন। আর কারণে-অকারণে আমাকে আর ছোট ভাইবোনদের ধরে ধরে পেটাতেন।

অথচ বাবা নাকি এমন ছিলেন না। মা কখনো-সখনো গল্প করতেন পুরনো দিনের। খুব স্বাস্থ্যবান আর হাসি-খুশী মানুষ ছিলেন বাবা। খুব ভালো বাঁশী বাজাতে পারতেন।

এ তো গেল বাবার কথা। আর মা বলতে চিনতুম শতচ্ছিদ্র ময়লা শাড়িপরা ছোট্টখাট্ট একজন মানুষকে, যিনি দিনরাত সব সময় রান্নাঘরের অন্ধকারে মিশে থাকতে ভালবাসেন। বাবার মার ও বকাঝকা থেকে আমাদের আগলে বেড়াতেন মা।

বড় হতে একটা ফ্রি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন বাবা। বাবার বোধহয় ইচ্ছে ছিল, আমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হই। বইপত্তর ছিল না কিছু। বাবা কিনে দিতে পারতেন না। কোনোমতে এদিক-ওদিক চেয়েচিন্তে আমি স্কুলের প্রথম দিকের কয়েকটা গণ্ডি বেশ ভালোমতোই পেরিয়ে এলাম।

কিন্তু যত বড় হতে লাগলাম, ততই সব যেন কেমন গুলিয়ে

যেতে লাগল। বাড়িতে এত অভাব-অনুযোগ আর ভালো লাগত না। বাড়িতে পড়াশুনার পরিবেশটাই আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। বাবা সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরেই চেঁচামেচি শুরু করতেন। ছুতোনাতা যে কোনো একটা কারণ পেলেই বাবা রেগে ওঠেন। ততদিনে মায়েরও ধৈর্যের সীমা ভেঙে গেছে। মা'ও কথায় কথায় জবাব দিতেন। ব্যস্, শুরু হয়ে যেত তুমুল ঝগড়া। বাবা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এসে হঠাৎ আমাদের হাতের কাছে পেয়ে মারতে শুরু করতেন। আমি হয়তো তখন পরের দিনের ক্লাস-টাস্কের অঙ্ক নিয়ে বসেছি। তত দিনে ঝণ্টু হয়েছে। চেঁচামেচি আর আমাদের কান্না শুনে ও কান্না জুড়ত। এর পর আমি মারের ভয়ে বাবা-মায়ের ঝগড়া শুরু হলেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকতাম।

ক্লাস ফাইভে ফেল করলাম আমি। বাবা কাজ থেকে ফিরে এসে এমন মারলেন যে, দু'দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলাম না আমি। মাকে বললেন, দু'দিন খাওয়া বন্ধ আমার।

মা আমাকে মৃদু অনুযোগ করতেন। মা বুঝতেন, আমার ফেল করবার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে, শুধু আমিই দায়ী নই। তবু মা বলতেন, সব কিছু উপেক্ষা করে আমি কেন শুধু লেখাপড়ায় মন দিই না? মা দুঃখ করে বলতেন, বাবা, তোর উপর আমাদের কত আশা! তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হবি। তোর বাবার দুঃখ ঘোচাবি।

কিন্তু আমি মাকে কি করে বোঝাব, সমস্তক্ষণ আমার মনটা কেমন হু-হু করে। এত কষ্ট আমার আর সহ্য হয় না। অভাব সহ্য হয়, দু'দিন না খেয়ে থাকলেও তোমার মুখ চেয়ে হাসিমুখে তা সহ্য করতে পারি। কিন্তু বাড়িতে এত অশান্তি, বাবার এত কষ্ট, তোমার এত দুঃখ কিছুতেই সহ্য হয় না। সবসময় মনে কেমন একটা ভয় গুড়-গুড় করে। মনে হয়, এর চেয়েও বড় কোনো দুঃখ

আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। বইখাতা নিয়ে পড়তে বসলেই এইসব আমাকে তেড়ে আসে। আমার মন বসে না, আমি কেমন হয়ে যাই।

বাবা ঘুমিয়ে পড়ার পর মা আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে দিল। বাবার মার খেয়ে আমার গায়ে বড় বড় কালসিটে পড়েছিল। মা সেইসব জায়গায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। রান্নাঘরের কুপির অস্পষ্ট আলো মায়ের একদিকের শিরা-ওঠা গালে পড়ছিল। মা হু-হু করে কাঁদছিলেন। জলের উপর আলো পিছলে পড়ে আমার বুকে এসে বিঁধছিল।

দুঃখে, কষ্টে, অপমানে আমার বুক ভেঙে যেতে লাগল। মনে হ'লো, আমার কী যেন করার আছে! কত কী যেন করার আছে আমার!

॥ তিন ॥

আমি আস্তে আস্তে আবিষ্কার করলাম, স্কুলে যাওয়ার চেয়ে গঙ্গার ধারের কাদা-ভরা ঐ মাঠটা অনেক বেশী আকর্ষণীয়, যেখানে স্থানীয় কিছু গোয়ালার ছেলে আর বস্তির ছেলে মিলে একটা ছোট রবারের বল পেটায়। আমি একদিন গাছতলায় বই খাতাপত্র রেখে ওদের দলে ভিড়ে গেলাম। বাবার তখন এমন একটা অবস্থা যখন তিনি সংসারের সব কিছুর উপরই বিরক্ত হয়ে উঠছেন। মা তখন অচল সংসারকে সচল করতে অবসর সময়ে ঠোঙা বানাতে শুরু করেছেন। তাই, আমার এই নতুন অ্যাডভেঞ্চার দু'জনেরই চোখ এড়িয়ে গেল।

সেই যে আমার প্রথম ফুটবল খেলা, তা নয়। এর আগে

প্রায়ই আমি আমাদের বস্তি বাড়ির এক চিলতে পায়ে-হাঁটা পথে কিংবা স্কুল-মাঠে দল বেঁধে বল পিটিয়েছি। তবু গঙ্গার ধারে ঐ মাঠটার উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, সে-ই আমার প্রথম বলে নেশা ধরল। প্রায় প্রতিদিনই স্কুল পালিয়ে ওই দলে ভিড়ে পড়তে লাগলাম। সে-ই প্রথম ফুটবলে নেশা ধরল।

দু'দিকে দুটো করে পাথর রেখে গোলপোস্ট বানানো হ'তো। আর মাঝখানের মাঠটুকুতে আমরা একদঙ্গল বেওয়ারিশ ছেলে একটা ছোট রবারের বলের পেছনে ছোটাছুটি করতাম। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, এখন আর আমাকে বলের পেছনে ছুটতে হয় না, বল আমার পায়ে লেগে থাকে সারাক্ষণ আর ছেলের দঙ্গল আমার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়। আমি তো অবাক! আমার পা-টা চুম্বক নাকি! বলটা যেন আমার পায়ে আঠার মতো লেগে থাকে। আর সেই বল নিয়ে আমি ঝড়ের বেগে দৌড়তে পারছি। এই আবিষ্কারটুকু আমাকে পাগল করে ফেলল।

এর পর আমার ধ্যান-জ্ঞান শুধু ফুটবল। সেজন্যে অপকর্মও করতে হয়েছে—রেশনের পয়সা চুরি করে একটা বড় রবারের বল কিনেছি। সেই বল নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে বাড়ির পাশের মাঠে পড়ে থাকি একা-একা। ছেলের দল আসে অনেক বেলায়—ন'টা-দশটায়। আমার ততক্ষণ তর সইত না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চা-রুটি খেয়ে বল নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম।

আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি। ছোট্ট একটা রবারের বলে আর আমাদের আশ মিটছে না। নেতাজী স্পোর্টিং-এর মাঠে দেখেছি, ছেলেরা চামড়ার আসল ফুটবলে খেলে। আমাদের তখন খুব শখ, ওই আসল ফুটবলে খেলব। কিন্তু আসল ফুটবল আমাদের দেবে কে? তার যে অনেক দাম! কত দাম?

আমরা একদিন দল বেঁধে বাজারে গেলাম। সাতাশ-আটাশ টাকা হলে একটা বল হতে পারে। কিন্তু সাতাশ-আটাশ টাকা

তখন আমাদের কাছে অনেক। অত টাকা আমরা কোথায় পাব ?

আমি তত দিনে অবিসংবাদীভাবে সেই বেওয়ারিশ দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছি। কিভাবে হলাম জানি না। তবে আমিই সবচেয়ে ভালো খেলি, সেইজন্যেই বোধহয়।

খেলার শেষে আমরা মাঠে বসে মিটিং করলাম। কী করা যায় ? কারো মাথায় কোনো বুদ্ধি আসছে না। চাঁদা দিয়ে অত টাকা তোলা তখন আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অনেক যুক্তি-তর্ক-আলোচনার পর হরি বুদ্ধি দিল। হরি বিহারী, জাতে গোয়ালা। আমাদের সঙ্গে মিশে-মিশে একেবারে বাঙালী হয়ে গেছে। হিন্দীর চেয়ে বাংলাটা বলে ভালো। আমাদের দলে থাকলেও, ও কিন্তু খেলতে পারে না। ওর একটা পা ছোট। খুঁড়িয়ে চলে। আমবা যখন খেলি, ও তখন মাঠের পাশে বসে আমাদের জামা পাহারা দেয়। খেলতে না পারলে কী হবে, ভেতরে-ভেতরে হরি কিন্তু রামবিচ্চু। আমাদের যত বুদ্ধি-পরামর্শ ও-ই যোগায়। স্কুলের রেজাল্ট কার্ডে বাবাকে সাইন না করিয়েই কিভাবে পার পাওয়া যাবে, বাড়ি ফিরতে বেশী দেরি হয়ে গেলে কী বলতে হবে, এসব পরামর্শে হরি অদ্বিতীয়। হরিকে আমরা বলতাম, 'বাঁকা হরি'। ছোটবেলায় ওর নাকি একবার কালাজ্বর হয়েছিল, তাতেই ওর মুখটা একটু বাঁকা হয়ে গেছে।

সেই হরিই শেষ পর্যন্ত মুশকিল আসান করল। বলল, জ্ঞান দাসের হাঁস ঝাড়লে হয় না ?

—হাঁস !

আমরা অবাক। জ্ঞান দাস এ অঞ্চলের বড়লোক, তাঁর অনেক-গুলো হাঁস আছে। তাঁর বাড়ির পুকুরে সেগুলো চরে বেড়ায় দেখেছি। কিন্তু সেসব চুরি করব কি করে ? জ্ঞান দাসের অনেক দারোয়ান-চাকর। অবশ্য বাঁকা হরির অসাধ্য কাজ কিছু নেই

আমরা জানতাম। একবার মুখ থেকে যা বেরিয়েছে তা ও কাজে দেখিয়ে ছাড়বে।

তবু আমি বললাম, চুরি করবি কি করে ?

—সে ভার আমার।—বাঁকা হরি বলল,—শুধু আমাকে একটা চটের থলি যোগাড় করে দিস তোরা।

চটের থলির ভার নিল রামু। ওরাও গোয়ালা। বাড়িতে কাটা খড় রাখার অনেক বস্তা আছে ওদের। তার একটা ঠিক ম্যানেজ করে আনতে পারবে ও।

পরদিন চটের বস্তা নিয়ে এলো রামু। খেলা শেষ হবার পর বাঁকা হরি সন্ধ্যেবেলায় সেই চটের বস্তা নিয়ে হাঁটা দিল একা। সঙ্গে কাউকে নিল না। আমরা অনেকেই যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাঁকা হরি বলল, তোদের নিয়ে কোনো লাভ নেই। তোরা উল্টে কেস গুব্‌লেট করে দিবি। একবার হাঁসেরা টের পেলে এমন চেঁচামেচি জুড়ে দেবে যে, খোদ জ্ঞান দাস ডাণ্ডা হাতে তেড়ে আসবে।

অগত্যা কী আর করা! বাঁকা একাই হাঁটা দিল। কাঁধে চটের বস্তা ফেলে ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামনের অন্ধকারে মিশে গেল। আমরা ক'জন দুরু-দুরু বক্ষে সন্ধ্যের অন্ধকারে গা ডুবিয়ে মাঠে বসে থাকলাম। পাশের গঙ্গা থেকে হু-হু করে হাওয়া আসছিল।

ঘণ্টা দু'য়েকের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বাঁকা হরি এলো। মুখে বিজয়ীর হাসি, কাঁধে বস্তা। এসেই বলল, চল্ তাড়াতাড়ি, জানাজানি হাওয়ার আগেই বাজারে গিয়ে বেচে আসি।

দিলু চকচকে চোখে বলল, ক'টা ঝেড়েছিস ?

—ছ'টা।

—ছ'টা!—দিলু গদ্‌গদ্—একটা দিয়ে ফিষ্টি করলে হয় না মাইরি!

ফিষ্টির ব্যাপারে অনেকেরই দেখলাম মত আছে। বাঁকা হরি আমাকে দেখিয়ে বলল, ওর আপত্তি না থাকলে হোক।

কিন্তু আমার মাথায় তখন বল লাফাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বললাম, না, আগে গিয়ে বেচে আসা যাক। কত দাম পাই দেখি। বেশী হলে তখন না হয় একটা নিয়ে এসে ফিস্টি করা যাবে।

সবাই তাতেই রাজী হ'লো। সেই রাত্রেই হাঁস বিক্রি করতে যাওয়া হ'লো। বাঁকা হরির এক আত্মীয় হাঁসের কারবার করে। বাঁকা হরির পরামর্শমতো তার কাছেই যাওয়া হবে সাব্যস্ত হ'লো। কেননা, বাজারে গেলে দোকানদার পরে জ্ঞান দাসকে বলে দিতে পারে কারা কারা হাঁস বেচতে এসেছিল। জ্ঞান দাস যখন দেখবে হাঁস নেই, তখন কাল নিশ্চয়ই একবার খোঁজ নেবে কেউ হাঁস বেচতে এসেছিল কি না। বাঁকা হরির আত্মীয়র কাছে সে ভয় নেই। সে চুরির মালই কেনে। কখনই কবুল করবে না কে এসে বেচে গেছে।

অতএব তার কাছেই যাওয়া স্থির হ'লো। সে বাঁকা হরিদের পাড়াতেই থাকে। রাতের অন্ধকারে তার কাছে যাওয়া হ'লো। লোকটা দাঁও বুঝে কম দাম দিল। বাজারে গেলে একটু বেশী দাম পাওয়া যেত। ছ'টা হাঁসে মোটে কুড়ি টাকা পাওয়া গেল।

আসল সমস্যাটা রয়েই গেল। আরো দশটা টাকা না হলে বল হচ্ছে না। কী করা যায়? আবার বাঁকা হরি মুশকিল আসান রূপে হাজির হ'লো। এবার সেমসাইড্ হবে ঠিক হ'লো। রামুর বাবার খাটাল থেকে একবস্তা খড় ঝাড়া হবে। রামু সানন্দে রাজী। বাঁকাকে সে-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল নিজেদের বাড়িতে।

বাঁকা হরি সেখান থেকে একবস্তা খড় ঝেড়ে পাশের খাটালে বারো টাকায় বেচে এলো।

এবার হাতে মোট বত্রিশ টাকা। উঃ, এ যে অনেক টাকা! এতদিনে হাতে স্বর্গ পেতে যাচ্ছি আমরা, আমাদের এই এত দিনের স্বপ্নের ফুটবল এবার সত্যি-সত্যি আমাদের পায়ে-পায়ে ঘুরবে।

রাতের অন্ধকারে আমরা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে জনা কুড়ি ছেলে বাঁকা হরি আর রামুকে ঘিরে হিপ হিপ হুররে ধ্বনি দিলুম।

ঠিক হ'লো, পরদিন সকালে আমি, বাঁকা হরি আর দিলু যাব কলকাতায় বল কিনতে।

সেদিন, বিছানায় শুয়ে আমার সারারাত একটুও ঘুম এলো না উত্তেজনায়।

॥ চার ॥

তারপর আমরা বেরোলাম দিগ্বিজয়ে।

নৈহাটীর পাড়ায়-পাড়ায় ম্যাচ খেলে চলেছি আমরা। আমরা জনা কুড়ি ছেলে:একসঙ্গে খেললেও, ম্যাচ খেলার সময় ওর মধ্য থেকে এগারো জনকে বেছে নেওয়া হত। বাঁকা হরি আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারি, আমি ক্যাপ্টেন। ম্যাচের আগের দিন সন্ধ্যায় আমরা দু'জনে মিলে প্লেয়ার ঠিক করতাম কারা কারা খেলবে। আমাদের ক্লাবের এবার একটা নাম হওয়া দরকার। নাম ওই বাঁকা হরিই দিল। ইলেভেন বুলেট। নাম পেয়ে আমরা সবাই খুশী।

বলটা থাকত আমার জিম্মায়। খেলার শেষে আমি বল নিয়ে বাড়ী ফিরতাম। বলটার আমি যা যত্ন করতাম তা মানুষ নিজের সন্তানের জন্যেও করে না। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে বলের হাওয়া খুলে ফেলতাম। তারপর শুরু হ'তো বলের পরিচর্যা। কাপড় দিয়ে মুছে মুছে বলের গা থেকে কাদামাটি তুলতাম। বলের গায়ে কোথাও একটু চামড়া চটে গেলে মনে হ'তো, যেন আমার নিজের গায়ের চামড়াই কোথাও খসে গেছে। বলের সমস্ত শরীরে ধরে ধরে

গ্রীস মাখাতাম। শুনেছিলাম তাতে নাকি চামড়া নরম থাকে। রাত্রে শোবার সময় বালিশের পাশে বলটা নিয়ে শুতাম। শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতাম।

উঃ, সে এক দিন গেছে। এর মধ্যে কি করে যে দুটো বছর কেটে গেছে, কে জানে! আর আশ্চর্য, এই দুটো বছর আমি স্কুলেও ফেল করিনি। একবারে ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে উঠেছি, আবার সিক্স থেকে সেভেনে।

রেজাল্ট অবশ্য খুব ভালো হয়নি। কোনোমতে পাস করে ওঠা যাকে বলে। পাস করেছিলাম বোধহয় এইজন্য যে, বুঝতে পেরেছিলাম কোনোমতে স্কুলের পরীক্ষাটায় পাস করতে পারলে বাবা আর আমার কোনো ব্যাপারে নজর দেবেন না। তাই ফাইনাল পরীক্ষার দিন কয় আগে আমি আদাজল খেয়ে লাগতাম। সেই কটা দিন খেলা বন্ধ থাকত। মনে মনে ভাবতুম, এই ক'টা দিন তো মাত্র, তারপর তো সারা বছর পড়ে থাকছে আমার খেলার জন্যে। পরীক্ষার ক'টা দিন যেন দম বন্ধ হয়ে আসত আমার। শুধু দিন গুনতাম কবে পরীক্ষা শেষ হবে, কবে আবার আমার ইলেভেন বুলেট নিয়ে পাড়ায়-পাড়ায় বেরুবো ম্যাচ খেলতে।

বাঁকা হরি সপ্তাহে দুটো করে ম্যাচ চ্যালেঞ্জ করে আসত। নিয়ম ছিল, যাদের মাঠে খেলা হবে তারা বল দেবে। বাঁকা হরি বুদ্ধি করে সব ম্যাচই অন্যদের মাঠে ঠিক করে আসত। ফলে আমাদের আর বল দিতে হ'তো না। আমাদের বলটা যত কম ব্যবহার করা যায় আর কি! কেননা, বল একবার ফেটে গেলে আবার সেই জ্ঞান দাসের হাঁস চুরি। সে বড় ঝামেলার।

ম্যাচ চ্যালেঞ্জ হত কাপের উপর। ছোট নিকেলের কাপ। দেড়টাকা-দু'টাকা দাম। প্রথম প্রথম একটা কাপের ম্যাচ চ্যালেঞ্জ হত। যারা জিতবে, তারা একটা কাপ পাবে।

মহা উৎসাহে খেলতে যেতাম আমরা। গোলে রতন, ব্যাকে

রামু আর দিলু, ফরোয়ার্ডে আমরা ক'জন। প্রত্যেকটা ম্যাচ জিততে লাগলাম আমরা। আস্তে আস্তে সাহস বাড়তে লাগল। এর পর দুটো-তিনটে কাপের চ্যালেঞ্জ নিতে লাগল বাঁকা হরি। এখানেও বাঁকা হরির বুদ্ধি কাজ করত। ও জানত, আমরা জিতবই। জেতা কাপগুলো নিয়ে ও খেলার দোকানে অর্ধেক দামে বিক্রি করে আসত। এইভাবে আমাদের ইলেভেন বুলেট ক্লাবের বেশ একটা ফাণ্ড তৈরী হ'লো। সেই ফাণ্ড ভেঙে ক্লাবের আর একটা বল কেনা হ'লো। ম্যাচের সময় সেই ফাণ্ডের পয়সায় লেবু কিনে খাওয়া হ'তো। ফাণ্ডের পয়সা থাকত বাঁকা হরির কাছে।

এই সময় একদিন ঘটনাটা ঘটল। ঘটনাটা আমার খেলার জীবনে এক সম্পূর্ণ মোড় ঘুরিয়ে দিল। ম্যাচ জিততে-জিততে বাঁকা হরির এমন সাহস দাঁড়িয়ে গেছিল যে, ও নৈহাটীর বিখ্যাত ক্লাব নেতাজী স্পোর্টিং-এর সঙ্গে একদিন ম্যাচ চ্যালেঞ্জ করে এলো। অবশ্য ওদের 'সি' টিমের সঙ্গে। তবু নেতাজী স্পোর্টিং বলে কথা!

এত দিন আমরা আমাদের মতোই রাস্তার টীমের সঙ্গে ম্যাচ খেলতাম। কিন্তু নেতাজী স্পোর্টিং যে সত্যিকার ক্লাব। মস্ত বড় ক্লাব ওটা। অনেক ছেলেমেয়ে খেলে সে ক্লাবে। ওদের ক্লাবের অ্যানুয়াল স্পোর্টসে কলকাতা থেকে মন্ত্রীরা আসেন, বড় বড় খেলোয়াড়রা আসেন। চারদিকে বিরাট বিরাট প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়। আমরা সেই প্যাণ্ডেলের আড়াল থেকে উঁকি মেরে ওদের ক্লাবের স্পোর্টস দেখি।

ওদের ক্লাবে মাস্টার আছেন। সেই মাস্টার ওদের ফুটবল খেলা শেখান। এই ব্যাপারটায় আমাদের কেমন খটকা লাগে। খেলার আবার মাস্টার কি হে! মাস্টার তো স্কুলে থাকে। খেলাধুলোয় যদি আবার কেউ মাথার উপর খবরদারি করার জন্যে থাকে, তবে খেলার মজাটাই তো মাঠে মারা যায়। আর ফুটবলে আবার শেখবার আছেটা কী। পায়ে বল নিয়ে বোঁ করে বিপক্ষের

গোলপোস্টে ছুটে গিয়ে গোল করে এসো, আর বিপক্ষের কেউ তোমাদের গোলের কাছে এলে মেরে তার ঠ্যাং খুলে নাও—এই তো মোদ্দা কথা! এর মধ্যে মাস্টারির জায়গাটা আবার কোথায়?

বাঁকা হরি রাজ্যেব খবর রাখে। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ব্যাপারটা। সেও হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। গম্ভীরভাবে বলেছে, ও বড় বড় ব্যাপাবে একটু বড় বড় পাকামি থাকবেই। তা না হলে বড় কিসের।

কিন্তু ম্যাচটা ম্যানেজ করল কিভাবে বাঁকা হরি? যদিও বাঁকা হবির বুদ্ধিতে আমাদের সবার অগাধ বিশ্বাস, তবু এই অসম্ভব ঘটনাটা ও ঘটালো কী কবে? নেতাজী স্পোর্টিং-এর মতো ক্লাব আমাদের মতো একটা রাস্তার টীমের সঙ্গে ম্যাচ গ্রহণ করল কি ভাবে? এটাই সবচেয়ে বড় রহস্য।

তা সেই রহস্যটাই পরে হাসতে হাসতে ভেঙেছে বাঁকা হরি। শুনে আমরা যেমন অবাক, তেমন থ।

নেতাজী স্পোর্টিং-এর গেম সেক্রেটারি গাঙ্গুলীবাবু ক'দিন আগে বাঁকা হরিদের খাটালে এসেছিলেন। এ অঞ্চলে বাঁকা হরিদের খাটাল সবচেয়ে বড়। গাঙ্গুলীবাবুর ছোট ছেলে সবে টাইফয়েড থেকে উঠেছে, খুব দুর্বল। ডাক্তার বলেছেন, রোজ আধ সের করে খাঁটি গরুর দুধের ব্যবস্থা করুন।

গাঙ্গুলীবাবু সেইজন্যেই বাঁকা হরিদের খাটালে এসেছিলেন দুধেব সন্ধানে। এখন দরকার পড়লে বাঘের দুধও মেলে, কিন্তু খাঁটি গরুর দুধ মেলে না। গাঙ্গুলীবাবু বাঁকা হরিকে চেনেন, রাস্তায় দেখা হলে কথা বলেন। তা' শুধু গাঙ্গুলীবাবু কেন, খাটালের সুবাদে বাঁকা হরিকে নৈহাটীর অর্ধেক লোক চেনে। যাই হোক, গাঙ্গুলীবাবু তো গেছেন ওদের খাটালে।

কিন্তু বাঁকা হরি বাঁকা হরিই। গাঙ্গুলীবাবু করুণ মুখে দুধের কথা বলতেই বাঁকা হরি সবল মুখে বলেছে, না গাঙ্গুলীদা, দুধ

কোথায় ? এখন গরমকাল, দুধ এমনিতেই কম। বাঁধা খদ্দেরদেরই ঠিকমতো দুধ দিতে পারছি না, নতুন যোগান দেব কোথা থেকে ?

গাঙ্গুলীদা কথা শুনে চুপসে গেছেন। করুণ মুখে বলেছেন, তোকে একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে হরি।

বাঁকা হরি নিরীহ মুখে বলেছে, অন্য খাটালে দেখুন না।

—দুধ তো সবাই দিতে চায়, কিন্তু খাঁটি দুধ কে দেবে বল্! তুই আমার অত্যন্ত পরিচিত। তুই তো আর আমাকে জল-দুধ দিবি না। তাই তোর কাছে আসা।

হরি দোনোমনো করে বলেছে, সেই তো কথা গাঙ্গুলীদা! আপনাকে ফেরাতেও পারছি না, আবার কোনো উপায়ও নেই।

গাঙ্গুলী এর পর হরির হাতে ধরে কাকুতি-মিনতি করেছেন, আমার মরা ছেলেটাকে তুই বাঁচা হরি। একটা ব্যবস্থা তোকে করে দিতেই হবে।

হরি এর পর গাঙ্গুলীদাকে টোপে গেঁথেছে,—সন্ধ্যেবেলা আপনার বাড়ি যাব, দেখি কি করতে পারি।

গাঙ্গুলীদা একরকম ভরসা পেয়েই বাড়ি ফিরেছেন। সন্ধ্যেবেলা যথারীতি আমাদের বাঁকা হরি গিয়ে উপস্থিত। গাঙ্গুলীদাকে বলেছে, দুধের ব্যবস্থা হতে পারে গাঙ্গুলীদা। কিন্তু তার বদলে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

দুধের কথা শুনে গাঙ্গুলীদা হাতে চাঁদ পেয়েছেন। বলেছেন, বাঁচালি বাবা হরি। কি করতে হবে বল্। আমার সাধ্যে থাকলে নিশ্চয়ই করব।

—আপনার সাধ্যে আছে অবশ্যই।

গাঙ্গুলীদা একটু সন্দিগ্ধ গলায় বলেছেন, বল্।

—আমার ক্লাবের সঙ্গে আপনার ক্লাবের একটা ম্যাচ দিতে হবে।

—অ্যাঁ—গাঙ্গুলীদা একেবারে চুপসে গেছেন,—বলিস কি রে

হরি! তা কি কখনো হয়? তোদের আবার ক্লাব কোথায়? কোথায় কোন্ এঁদো মাঠে ক'টা বস্তির ছেলে বল পেটায়, তাদের সঙ্গে নেতাজীর খেলা! তাছাড়া রেজিস্টার্ড ক্লাবের সঙ্গে আন্-রেজিস্টার্ড ক্লাবের ম্যাচ হয় কখনো শুনেছিস?

হরি গম্ভীরভাবে বলেছে, এখনকার দিনে কখনো খাঁটি দুধের কথা শুনেছেন? দেখুন ভেবে। যদি ব্যবস্থা করতে পারেন, তবে দুধ পাবেন। আমার খাটালে গিয়ে খবর দেবেন।

কথাগুলো বলে সটান হাঁটা দিয়েছে বাঁকা হরি।

পেছন থেকে গাঙ্গুলীদা করুণ গলায় ডেকেছেন, হরি, হরি, শোন্, শোন্!

হরির কানে সে ডাক পৌঁছায়নি। হনহন করে হেঁটে চলে এসেছে।

বেচারা গাঙ্গুলীদা! ক্লাবের প্রেস্টিজের চেয়ে ছেলের স্বাস্থ্য অনেক বড় কথা। তারপর কিভাবে যেন গাঙ্গুলীদা ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারির হাতে-পায়ে ধরে এই ম্যাচটার ব্যবস্থা করেছেন।

বাঁকা হরির অনেকদিনের সাধ নেতাজী স্পোর্টিং-এর সঙ্গে ম্যাচ নেওয়া। ওর কাজই শুধু ম্যাচ চ্যালেঞ্জ করা। বুদ্ধি করে, বিপাকে ফেলে, নেতাজীর সঙ্গেও ম্যাচ আদায় করেছে। কিন্তু এবার বোধহয় বাঁকার কাজটা গোঁয়ারতুমির পর্যায়ে চলে গেল।

বেশ ছিলাম এতদিন। বাদা-বনে শেয়ালরাজা। যত রাস্তার টীমের সঙ্গে ম্যাচ চ্যালেঞ্জ করে চার গোলে পাঁচ গোলে জিতে এসেছি। জিতে গর্বে বুক দশ হাত হয়েছে। মনে মনে নৈহাটীর চ্যাম্পিয়নই ভেবে এসেছি নিজেদের। কিন্তু এবারে বুঝি সেই দশহাত হাওয়া-ভরা বুকে পিন ফুটল। ক'গোলে হারব, কে জানে! নেতাজী স্পোর্টিং বলে কথা! এ কি যে সে টীম!

রাগে দুঃখে বাঁকা হরির ঝুঁটি ধরে নাড়তে ইচ্ছে করছে।

তার উপর সবচেয়ে বড় কথা, ওরা যে জার্সি পরে খেলে!

॥ পাঁচ ॥

এখন ভাবি, ভাগ্যিস বাঁকা হরি ওদিন ম্যাচটার ব্যবস্থা করেছিল। তা না হলে আজকের এই আমি কোথায় পড়ে থাকতাম! মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার খেলার ভাগ্য-দেবতা সেদিন অদৃশ্য হাতে সুতো নেড়েছিলেন ঐ ম্যাচটার ব্যবস্থা করতে। বাঁকা হরি নিমিত্তমাত্র।

তা না হলে গণেশদার সঙ্গে আলাপ হ'তো কি কোনোদিন?

রবিবার দিন খেলা। বাঁকা হরির উৎসাহ দেখে কে! আমাদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। বাঁকা হরি প্রত্যেককে অর্ডার দিল গেঞ্জি আর প্যাণ্ট কেচে রাখতে। নেতাজীর সঙ্গে খেলা। নোংরা গেঞ্জি পরে খেলা যায় না। বাঁকা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে জনা পঞ্চাশেক সমর্থক যোগাড় করল। তারপর রবিবার তিনটের সময় রওনা হলাম আমরা নেতাজী স্পোর্টিং-এর উদ্দেশ্যে। খেলা সাড়ে চারটেয়।

মাঠে গিয়ে আমরা চুপসে গেলাম। মাঠ সুনসান, খালি। কোনো লোকজন নেই। খেলার কোনো ব্যবস্থাও নেই। বুঝলাম, ওরা এ খেলাটায় কোনো গুরুত্ব দেয়নি। বাঁকা হরি কিন্তু আমাদের বিরামহীন উৎসাহ দিয়ে চলেছে,—আরে, ব্যস্ত হোস না, ওরা ঠিক ব্যবস্থা করবে দেখবি। বড় ক্লাব, বুঝলি না, ওদের ব্যবস্থা করতে দু'মিনিট সময় লাগে।

রতন সন্দিগ্ধ গলায় বলল, ওরা ম্যাচ খেলবে তো?

বেচারা বাঁকা হরি অবস্থা দেখে মনে মনে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে। কিন্তু উপরে উপরে ডাঁট দেখিয়ে বলল, খেলবে না মানে! বড় ক্লাব কখনো কথা দিয়ে কথার খেলাপ করে না। হুঁ হুঁ বাবা, নেতাজী স্পোর্টিং বলে কথা!

দেখলাম, সত্যি সত্যি ওরা কথার খেলাপ করল না। বেলা সোয়া চারটের সময় কোথা থেকে দুটো মালী এসে দু'পাশে দুটো গোলপোস্ট পুঁতে গেল। তারপর চুন দিয়ে মাঠে কিছু দাগ দিল। চুনের দাগ দেওয়া মাঠে কোনোদিন খেলিনি। মনে মনে বেশ ঘাবড়ে যাচ্ছি আমরা।

খেলা শুরু হওয়ার মিনিট পাঁচেক আগে ওদের টীম নামল। জনা বারো-তেরো ছেলে ওদের ক্লাবঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে একজন রেফারী, দু'জন লাইন্সম্যান। ওদের টীম দেখে আমরা দমে গেলাম।

কমলা রঙের গেঞ্জি আর সাদা প্যান্ট পরেছে ওরা। সবার কেমন ঝকঝকে চেহারা। হাঁটুতে নিক্যপ, মোজা, পায়ে কালো ঝকঝকে বুট।

খেয়েছে! বুট! বুট পরে খেলবে ওরা!

আর আমরা ক'জন ছেঁড়া গেঞ্জি আর ছেঁড়া প্যান্ট পরা, খালি পা। ওরা বুট পরে খেলবে এমন কথা বাঁকা হরি আমাদের ঘুণাক্ষরেও বলেনি। আমরা খালি পায়ে ওদের বুটের সঙ্গে পারব কি করে? একটা বলও ছুঁতে পারব না যে! আমি বাঁকা হরির খোঁজ করলাম। ও ততক্ষণে হাওয়া। ব্যাপারটা ওরও বোধ হয় মাথায় আসেনি। তা না হলে ও গাঙ্গুলীদার সঙ্গে শর্ত করে নিত, খালি পায়ে খেলতে হবে। অবস্থা বিপাক দেখে বাঁকা হরি এখন কোথায় লুকিয়েছে, কে জানে! তবে কাছে-পিঠেই কোথাও আছে জানি। খেলা শুরু হলে ঠিক টুক করে লাইনের ধারে এসে দাঁড়াবে।

রেফারী টস করতে ডাকল। আমি ক্যাপ্টেন। এগিয়ে গেলাম। ওরা টসে জিতে সাইড নিল। আমাদের সেন্টার। আমরা মাঠে এসে দাঁড়ালাম। রেফারী ঘড়ি দেখছেন, খেলা শুরু করবেন। মাঠের ধারে ওদের কর্মকর্তার মতো ক'জন এসে দাঁড়িয়েছে। গাঙ্গুলীদাও তাঁদের মধ্যে আছেন।

খেলা শুরু হ'লো। কিন্তু আমরা পাত্তাই পেলাম না।

আমি সেণ্টার করে বল দিলাম পিনকুর পায়ে। পিনকু বল নিয়ে এগোল ছেনোকে দিতে, মাঝপথে ওদের হাফ ব্যাক খুব সহজেই পিনকুর পা থেকে বল কেড়ে নিল, নিয়ে লম্বা শটে আমাদের হাফ লাইনের কাছে বল ফেলল। বল ধরল ওদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড। দিলু গোঁয়ারের মতো এগিয়ে এলো বাধা দিতে, কিন্তু বুট দেখে ভয় পেয়ে গেল। ওদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড বল ঠেলল বাঁ দিকের লেফ্‌ট আউটকে। লেফ্‌ট আউট বল নিয়ে ধাঁ করে এগিয়ে গেল টাচ লাইন ধরে একেবারে কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে। ওখান থেকে উঁচু করে সেণ্টার করল গোলমুখে, ওদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড এগিয়ে এসে হেড করে গোলে বল ঠেলে দিল। রতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। করার কিছু ছিল না ওর।

আমরা হারব জানতাম। কিন্তু প্রথম মিনিটেই এমন দাঁড়িয়ে গোল খাব কল্পনা করিনি।

মিনিট সাতেক পর আবার গোল। নিখুঁত ছকে-বাঁধা খেলা। আমরা কেউ ওদের ধরতেই পারছি না। আমরা কেউ বল ধরলেই ওদেব তিনজন ছেলে ঘিরে ধরে। অথচ ওরা বল পেলে ফাঁকা মাঠে বল নিয়ে এগোয়। আমাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন নিখুঁতভাবে ওরা বল পাস করছে।

আমি সেণ্টার লাইনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম কোমরে হাত দিয়ে আমাদের গোলের দিকে তাকিয়ে। যত খেলা সব আমাদের গোল এলাকার মধ্যে হচ্ছে। আমি একটাও বল পেলাম না। মাঝে মাঝে দু-একটা উড়ো বল পেলাম। কিন্তু সে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে আমাদের দলের কাউকে পেলাম না আশেপাশে। তার আগেই ওদের দু-তিনজন এসে আমাকে ঘিরে ধরে বল কেড়ে নিল। আমাদের গোলমুখে বিশ্রী জটলা বেধে গেছে। আমাদের দলের খেলোয়াড়রা যে যেখানে পাচ্ছে দুমদাম করে বল ওড়াচ্ছে।

বুঝলাম, ওরা আর বেশী গোল দিতে চায় না। এবার ওরা আমাদের খেলা দেখাতে লাগল। বল নিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে আমাদের নাকাল করে ছাড়ল। সারা মাঠে লোক আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করছে। অপমানের একশেষ। হাফ টাইমের আগে ওরা আর একটা গোল দিল। তিন গোল! এত বাজে খেলব আশা করিনি।

কুড়ি মিনিট-কুড়ি মিনিট মোট চল্লিশ মিনিটের খেলা। কুড়ি মিনিটের মাথায় রেফারী হাফ টাইমের বাঁশী বাজালেন।

আমরা মাথা নিচু করে মাঠের বাইরে এলাম। সবার মুখ থমথমে। রতন কাঁদছে। বাঁকা হরি ফিরে এসেছে। পিনকুর হাঁটু ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছে। গাঁদা পাতা ডলে বাঁকা হরি ওখানে রস লাগাচ্ছে।

দাঁত বের করে হাসতে হাসতে গাঙ্গুলীদা এলেন। বাঁকাকে বললেন, কি রে, খেলার আশ মিটেছে?

বাঁকা হরি থমথমে মুখে মাথা নীচু করল।

—আরে, এঁদো গলিতে খেলে নেতাজী স্পোর্টিং-এর সঙ্গে ম্যাচ খেলার শখ! তোর শখেরও বলিহারি! তখনই বলেছিলাম, ল্যাজে-গোবরে হবি হরে, শুনলি না। এখন শোন্ এতগুলো লোকের টিটকিরি।

লোকটার চেহারা দেখে আর কথা শুনে আমার হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল। মনের ভিতর একটা জেদ কোথা থেকে দাউ দাউ করে উঠতে লাগল। একথা ঠিক, আমরা এত বাজে খেলি না। পিনকু, ছেনো, আমি এখনো দাঁড়ালে এদের এক হাত দেখে নিতে পারি। আসলে প্রথম থেকে আমরা বড্ড ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

বাঁকা আমার কাছে এল। বলল, তোর কথা না শুনে ভুল হয়ে গেছে। আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি, তোদের এমন অপমান হবে।

বাঁকা চুপ করল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একবার পিনকুর কাছে

গেল। আবার ফিরে এল আমার কাছে। তারপর ফিসফিস করে বলল, আসলে বুঝলি, বহুদিনের শখ ছিল নেতাজীর সঙ্গে একটা খেলা···সে যা হোক, আমাকে মাপ করে দিস।

আমি খপ করে হরির হাত চেপে ধরলাম। হরির চোখ চকচক করছে। বললাম, এই হরি!

হরি চাপা গলায় বলল, আসলে ওদের সঙ্গে পারা যায় না, না রে?

ব্যস্, এই একটা জায়গায় আমার জিদ মাথায় গিয়ে দপ করে জ্বলে উঠল। ফুটবলে পারা যায় না, এই কথাটা শুনলে আমার শরীর রি রি করে ওঠে।

আমি রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি, পায়ে বল থাকলে আমি দেবতাদেরও হারিয়ে দিতে পারি। আর এ তো নেতাজী স্পোর্টিং! ভারী আমার কমলা রঙের জার্সি রে!

রেফারী খেলা শুরু করার বাঁশী বাজাল। আমি মাঠে ঢুকতে যাচ্ছি, দেখি টাচ লাইনের পাশে বাঁকা হরি আমাদের জামা-কাপড় আগলে বসে আছে। কাঁদছে। আমি মাঠে ঢোকার আগে পিনকু, ছেনো, দিলু আর কেষ্টকে কাছে ডাকলাম।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হ'লো। সেণ্টার করতে ওরা বল নিয়ে এগোল। পিনকু আর ছেনো সেণ্টার লাইনের দু'দিকে দাঁড়িয়ে রইল। আমি দ্রুত নীচে নামলাম। আমাদের হাফ লাইনের নীচে দিলু ওদের সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে বাধা দিল। আমি ওদের খেলার ছকটা মোটামুটি বুঝেছি এতক্ষণে। সেই অনুসারে আমি জানি এখন কি হতে যাচ্ছে। আমি জায়গা নিলাম। মনে মনে বললাম, দাঁড়া বাঁকা, আর একবার ভেলকি দেখাচ্ছি তোকে। আমাদের উপর বিশ্বাস করে তুই খুব একটা অযোগ্য পাত্রে বিশ্বাস অর্পণ করিসনি।

আমার ধারণামতো দিলু ওদের সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে বাধা দিতেই

ও বল ঠেলে দিল লেফট্ ইনের পায়ে। আমি তৈরীই ছিলাম। লেফট্ ইন বল পেতেই আমি পেছন থেকে ওর পায়ের ফাঁক দিয়ে বল ঠেলে দিলাম আমাদের রাইট ব্যাক মান্‌কের পায়ে।

লেফট্ ইন বা সেণ্টার ফরোয়ার্ড কেউই এটা কল্পনা করেনি। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মান্‌কে বল পেয়েই দিলুর পায়ে দিল। দিলু পায়ে বল নিয়ে উঠে এসেই বাঁদিকে আমাকে বাড়াল। বল বাড়াতেই যথারীতি ওদের রাইট হাফ, রাইট ইন আর সেণ্টার ফরোয়ার্ড আমাকে ছেঁকে ধরল। আমাদের হাফ লাইনে বল। সেই জেদটা মাথায় ঝিকঝিক করছে, বুট আর কমলা জার্সি বার করছি, দাঁড়াও! বাঁ পায়ের আড়ালে বল নিয়ে আমি শরীরে আমার সেই প্রিয় ঝাঁকিটা লাগালাম। ওরা আমার ডান পায়ের দিকে সরে এলো। আমি চকিতে বাঁ দিক দিয়ে বল নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মাঠ জুড়ে চাপা আওয়াজ শুনলাম। বল নিয়ে দ্রুত ভেতর দিক ভেঙে এগিয়ে এলাম। লেফট্ হাফ আর লেফট্ ব্যাক বাধা দেবার জন্য তৈরী ছিল। কিন্তু আমার পায়ের টোয়ের উপর বল থাকলে আমি এইসব বাধাকে বাধা বলেই মনে করি না। চকিতে ডান পায়ের উপর বল নাচিয়ে ওদের কেটে বেরিয়ে এলাম। ওদের ব্যাক বুট পায়ে আমায় লাথি মারল। রেফারী বোধহয় দেখতে পাননি। আমিও উপেক্ষা করলাম। এবার মাঠের সেই চাপা আওয়াজটা বাড়তে শুরু করেছে। বল কোণাকুণি পিন্‌কুর কাছে বাড়ালাম। পিন্‌কু বল নিয়ে বাইরে কেটে বেরিয়ে এল। আমি ভেতরে ছুটলাম। ব্যস্, এবার যদি পিন্‌কুর কাছ থেকে বলটা পাই!

লেফট্ ব্যাক, স্টপার, দুই হাফ ততক্ষণে গোলের মুখে জায়গা করে নিয়েছে।

পিন্‌কু ঝুলিয়ে বল দিল আমাকে। মাটি-ঘেঁষা বল হলে সুবিধা

হ'তো। কিন্তু এ-ই সই। পেনাল্টি লাইনের কাছে বল থাই-এ নিয়ে পায়ে নামালাম। তারপর ওদের প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ না দিয়ে চলতি বলে চকিতে শট নিলাম বাঁ পায়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের তিনজন ব্যাক ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার ওপর। আমি সবসুদ্ধ নিয়ে পড়লাম মাটির ওপর।

এবার মাঠ ভেঙে আওয়াজ হচ্ছে। বাঁকা পঞ্চাশজন সমর্থক যোগাড় করে এনেছে আমাদের।

রেফারীর গোল হওয়ার হুইস্‌ল্‌ একটা মধুর বাঁশীর মতো বাজল আমার কানে।

দু'মিনিট পর আবার গোল। আমি জানি, আমার পায়ে একটা রহস্যময় চুম্বক আছে, যাতে বল লেগে থাকে আঠার মতো। সেই চুম্বকটা আবার ফিরে আসছে আমার পায়ে। গঙ্গার পারে সেই এঁদো মাঠে খেলার সময় দেখেছি, বল আমার পায়ে পায়ে লেগে থাকে। আর জনা কুড়ি ছেলে জোট বেঁধে আমার পেছন পেছন দৌড়োয়। এর জন্য অবশ্য আমার যে খুব একটা কৃতিত্ব আছে তা নয়। ঐ যে বললুম, আমার পায়ে নিশ্চয়ই চুম্বক আছে। অন্যদের পায়ে সেটা নেই।

এর পর দেখা গেল, নেতাজীর দশজন প্লেয়ার আমার পায়ে পায়ে ন্যাংলার মতো ঘুরে মরছে। আর আমি, পিনকু, ছেনো সারা মাঠ দাপিয়ে ফিরছি।

দ্বিতীয় গোলটা হ'লো এইভাবে। হাফ লাইনে বল ধরে মানুকে আমাকে ভেতর দিকে বল ঠেলল। আমি বল ধরেই ভেতর দিকে ভেঙে এগিয়ে এলাম দ্রুত, চকিতে। পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে ফাঁকা, ছেনো, বল বাড়ালেই নির্ঘাৎ গোল। কিন্তু মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি জাগল। খেলা দেখানোর লোভ সামলাতে পারলাম না। ততক্ষণে বুঝে গেছি, জার্সি পরে থাকলেও ওরা কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। একাই বল নিয়ে ওদের পেনাল্টি এরিয়ায় ঢুকে

পড়লাম। ওদের ছ'জনের তৈরী ডিফেন্স তছনছ হয়ে ভেঙে পড়েছে তখন। সামনে গোল, ঠেললেই গোল। কিন্তু ঠেললাম না। পায়ের ডগায় বল নিয়ে নাচালুম। গোলকিপার ঝাঁপিয়ে পড়ল পায়ে, ঝাঁপিয়ে পড়তেই ডান পা থেকে টোকা মেরে বল বাঁ পায়ে নিয়ে গোলকিপারের মাথা টপকে নেটে পাঠালুম।

এইভাবে নাস্তানাবুদ করা গোল নেতাজীকে কেউ দিতে পারে ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। মাঠ তখন স্তব্ধ, নির্বাক। তারপর ভেঙে পড়লো চিৎকারে, উল্লাসে।

কিন্তু এ তো সবে শুরু। শুরু হ'লো আমাদের অ-প্রতিহত বিজয়-অভিযান। খেলার শেষ দশ মিনিটে আরও দুটো গোল হ'লো। ছেনো আর পিনকু ভাগাভাগি করে গোল দুটো করল। দু'জনকেই পেনাল্টি বক্সে বল ঠেলে দিয়েছিলাম আমি। তৃতীয় গোলটা হওয়ার পর লক্ষ্য করেছি, টাচ লাইনের পাশে গাঙ্গুলীদার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বাঁকা হরি। গাঙ্গুলীদার চশমা নাকের ডগায় ঝুলে পড়েছে।

খেলা শেষ হতেই বাঁকা খোঁড়া পা নিয়েই দৌড়ে মাঠে ঢুকল। আমাকে, থুড়ি, আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরল। ততক্ষণে কারা যেন আমাকে কাঁধে তুলে নিয়েছে।

বাঁকা বলল, দেখলি, কেন নেতাজীর সঙ্গে ম্যাচ নিয়েছিলাম। আমি জানি, তুই থাকলে সারা পৃথিবীকে আমরা হারিয়ে দিতে পারি।

সারা পৃথিবী!—আমি হেসে ফেললাম।

বাঁকা গোঁয়ারের মতো মাথা বাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ, সারা পৃথিবী।

আমরা নেতাজীর মাঠ থেকে ফিরছিলাম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। খেলা-জয়ের আনন্দে সারা মন ভরপুর। এমন সময় একজন লোক পেছন থেকে ডাকল আমাকে। ফিরে দাঁড়ালাম আমরা সবাই।

দেখি, বছর পঞ্চাশ বয়সের একজন শক্ত-সমর্থ লম্বা চেহারার মানুষ। মাথার চুল উল্টে আঁচড়ানো। শক্ত চোয়াল, দু'পাশের গালের হাড় দেখা যায়। দুটো ঝকঝকে চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

বললেন, তোমার নাম কি ভাই ?

গলার স্বর অদ্ভুত নরম। মনে হ'লো, যেন কত দিন চেনেন আমাকে।

নাম বললুম।

—কোথায় থাক ?

আমি একটু অবাক। বাড়ির ঠিকানা জানালুম।

ব্যস্, ভদ্রলোক আর কোনো কথা বললেন না। পেছন ফিরে আবার চলে গেলেন নেতাজীর ক্লাবঘরের দিকে।

আমি আরো বেশী অবাক। হ'লো কি ব্যাপারটা ? ভদ্রলোক এলেন, নাম জিজ্ঞাসা করলেন, ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর আবার পেছন ফিরে হাঁটা দিলেন! আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, ভদ্রলোক বোধহয় আমার খেলার প্রশংসা করতে এসেছেন। দুটো ভালো ভালো কথা বলে আমার পিঠ চাপড়ে চলে যাবেন। অনেক জায়গায় খেলতে গিয়ে যেমন হয়েছে। মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে খেলা দেখেন এমন বয়স্ক কিছু কিছু লোক খেলার শেষে এসে আমার পিঠ চাপড়ে যান।

আমি এমনই অবাক যে, ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলুম। দেখি, আমার পাশে দাঁড়িয়ে বাঁকা হরিও তাঁর ফিরে যাওয়ার দিকে চেয়ে আছে।

আমি একটু বিরক্ত গলায় বললুম, কে রে ভদ্রলোক ?

বাঁকা তখনও চেয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর অস্ফুট গলায় বলল, গণেশদা!

বাঁকা হরির গলায় ঐ গণেশদা নামটা বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হ'লো।

গণেশদা আবার কে? কোন্ হরিদাস পাল! পাশে দাঁড়ানো বাঁকা হরিকে সেটাই জিজ্ঞাসা করলাম।

বাঁকা হরি ফিসফিস করে বলল, নেতাজীর ফুটবল মাষ্টার।

আমি বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বললাম, হুঁঃ, মাষ্টার! ফুটবলের আবার মাষ্টার!

আমাদের দলের ছেলেরা এগিয়ে গেছে। আমরা আবার হাঁটা শুরু করলাম। পাশে বাঁকা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। বাঁকা বলল, একসময় খুব নামকরা প্লেয়ার ছিলেন। ইস্টবেঙ্গলে খেলতেন। নৈহাটীর সবাই চায় ওঁর মতো প্লেয়ার হতে। উনি এসে তোর সঙ্গে কথা বলতে আমার এত আনন্দ হচ্ছিল যে, আমি তোকে ওঁকে প্রণাম করতে বলতে ভুলে গেলাম। তুই নিশ্চয়ই একদিন ওঁর মতো বড় প্লেয়ার হবি। দেখিস, আমি বলে দিলাম।

এতক্ষণে বাঁকার গলায় শ্রদ্ধার রহস্যটা বোঝা গেল। কিন্তু আমার মনে লোকটার সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া গেল না। মাষ্টার না ছাই! মাষ্টার হলে আমি এত ভালো খেলেছি দেখে নিশ্চয়ই প্রশংসা করতেন। আমি দুটো গোল করেছি, আরো দুটো গোল বানিয়ে দিয়েছি তবু লোকটার মুখ দিয়ে ভালো কথা বেরোল না। লোকটা আসলে হিংসুটে। নিজের দল হেরেছে কিনা, তাই সহ্য করতে পারছে না।

আমি গজ গজ করতে করতে লোকটার সম্বন্ধে আমার বিরূপ মনোভাব বাঁকাকে জানিয়ে দিলাম। বাঁকা উত্তরে কিছু বলল না, চুপ করে রইল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল আমার পাশে পাশে।

তার অনেকদিন পর বুঝেছি গণেশদা আমার খেলার প্রশংসা করেননি কেন। আসলে সেদিন আমি খুব খারাপ খেলেছিলাম।

গণেশদা এখনো আমাকে মাঝে মাঝে সেই খেলাটার কথা তুলে ঠাট্টা করেন। আমি লজ্জায় মাথা নীচু করে ফেলি।

॥ ছয় ॥

পরদিন সকালবেলা। খেলতে যাওয়ার আগে রান্নাঘরের সামনে বসে গুড় দিয়ে রুটি খাচ্ছি। মা রান্নাঘরে বসে রুটি সেঁকছেন।

এমন সময় ঝণ্টু দৌড়ে এসে বলল, দাদা, বাইরে একজন ভদ্রলোক তোকে ডাকছেন।

আমি একটু অবাক হলাম। আমাকে আবার কোন্ ভদ্রলোকের দরকার পড়ল? তার উপর আবার এই সাত-সকালে! একটু দ্বিধান্বিত পায়েই বাইরে এলাম। এসে যাঁকে দেখলুম, দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক। বিস্ময়ের কোনো তল-বেতল খুঁজে পেলাম না। প্রায় মিনিট খানেকই বোধহয় হাঁ করে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। গণেশদা সাইকেলে হেলান দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

গণেশদা আমাকে দেখে হাসলেন,—কি রে, জল-খাবার খাচ্ছিস? যা, খেয়ে আয়!

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। গণেশদা তাড়া দিলেন,—দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে আয়।

সেই মুহূর্তে আমি দুটো জিনিস বুঝে গেলাম। এক: এই ভদ্রলোকের মুখের ওপর কথা বলা যায় না। দুই: এই ভদ্রলোক হাসি দিয়ে মুহূর্তে যে কোনো ছেলেকে জয় করে নিতে পারেন।

আমি মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকলাম। কোনোমতে রুটিগুলো

দলা পাকিয়ে মুখে গুঁজে জল দিয়ে গিলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। গণেশদা সেই ঝরঝরে সাইকেলটার গায়ে হেলান দিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক সেইভাবে। পরে জেনেছি, এই সাইকেলটার প্রতি গণেশদার অদ্ভুত দুর্বলতা আছে। গণেশদা এই পৃথিবীতে দুটো জিনিসকে ভালবাসেন। এক : ফুটবল, দুই : এই সাইকেল। তারপর গণেশদাকে এই সাত-আট বছর ঘনিষ্ঠভাবে দেখছি, সাইকেল বাদ দিয়ে গণেশদাকে ভাবা যায় না।

এখন অবশ্য আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় গণেশদা কাকে বেশী ভালবাসেন।—তাঁর সাইকেলকে, না আমাকে? মাঝে মাঝে মনে হয়, বোধহয় আমাকেই। আসলে এখন গণেশদার জগতে দুই নম্বর জায়গাটা নিয়ে আমাতে আর সাইকেলটাতে একটা অদৃশ্য লড়াই চলেছে।

আমি বেরিয়ে আসতে গণেশদা বললেন, আয়।

তারপর গণেশদা সাইকেল ঘুরিয়ে আগে আগে হাঁটতে লাগলেন। আমি বাধ্য ছাত্রের মতো পেছনে পেছনে। প্রায় আধ-মাইল হেঁটে আসার পর গঙ্গার পারে একটা কাঠগোলার পেছনে ছোট্ট মাঠের মতো জায়গায় গণেশদা বসে পড়লেন। জায়গাটা নির্জন, ঠাণ্ডা। লোকজনের চলাফেরা কম।

গণেশদা সামনের ঘাসে-ঢাকা জমিটুকু দেখিয়ে বললেন, বোস্।

আমি নিঃশব্দে বসে পড়লাম।

গণেশদা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, তোর বাবা কী করেন?

তারপর একে একে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের বাড়ির অবস্থা জেনে নিলেন। বাবা কত মাইনে পান, কয় ভাইবোন আমরা, কী করে চলে আমাদের, মা ঠোঙা বানিয়ে মাসে ক'টাকা পান, আমি কোন্ ক্লাসে পড়ি, আমার খেলার প্রতি বাবার মনোভাব কেমন, ক'বছর খেলছি আমি, বড় হয়ে আমার কী হতে ইচ্ছে করে, বাড়ির

সাহায্যের জন্য এখনই আমাকে কোনো কাজে-কর্মে ঢুকে পড়তে হবে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি এক-এক করে গণেশদার সব কথার জবাব দিয়ে গেলাম। বললাম, বাবা আর সংসার চালাতে পারছেন না। বাড়ির অভাব-দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াতে গিয়েই খেলা শুরু করেছি। যতক্ষণ খেলি ততক্ষণ সব ভুলে থাকি। পড়াশুনায় মন বসাতে পারি না। পড়তে বসলেই রাজ্যের অভাব আর ভয় আমাকে হাঁ করে গিলতে আসে। গণেশদা যদি আমাকে পঞ্চাশ টাকা মাইনেরও একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারেন, তবে আমাদের খুব উপকার হয়। আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব ওঁর কাছে। আমার ভাই ঝণ্টু চিকিৎসার অভাবে খোঁড়া হয়ে যাচ্ছে। উমাটা অভাবের জন্যে স্কুলেই যেতে পারল না। আমি দাদা হয়ে এইসব আর সহ্য করতে পারি না। যদিও আমার বয়স খুব বেশী নয়, তবু আমিই তো বাড়ির বড় ছেলে। আমার মতো অনেক ছেলেই তো কাজ করে।

আমি গলগল করে বিনাদ্বিধায় গণেশদাকে সমস্ত কথা বললাম। বলতে কোনো সংকোচ হ'লো না। বরং মনে হ'লো, এই প্রথম একজন লোককে আমার মনের কথা বলতে পেরে বুকটা অনেকটা হালকা লাগছে।

গণেশদা চুপ করে সব শুনলেন। শোনার পর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। কথা বলা শেষ করার পর আমি এখন চুপ করে বসে আছি। এক সময় একটু কেঁদেও ফেলেছিলাম আমি। হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে এখন চোখ কটকট করছে।

গণেশদা গঙ্গার দিকে চেয়ে ছিলেন। ওঁর সাদা চোখ-দুটোতে কেমন ক্লান্তির ছায়া পড়েছে। অনেকক্ষণ পর গণেশদা নিজের মনেই বললেন, এ-ই হয়। আমাদের দেশে এ-ই হয়। কত ছেলে তোর মতো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একটু খাওয়ার অভাবে, একটু যত্নের অভাবে, একটু দয়ার অভাবে!

জানিস, কাল তোর খেলা দেখে সারারাত ঘুম হয়নি আমার। যদিও তোর খেলায় অসংখ্য ভুলত্রুটি ছিল, অনেক খারাপ জিনিস ছিল। কী ছিল সে তোকে পরে বলব। কিন্তু তোর খেলা দেখে আমি বুঝেছিলাম, হ্যাঁ, এই একজন প্লেয়ার আসছে। একে বাঁচাতে পারলে, একে ধরে রাখতে পারলে, এ একদিন ফুটবলকে বাঁচাবে। ফুটবল তোদের মতো এক-একজন প্লেয়ারের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। আমার কুড়ি বছরের কোচ জীবনে আমি যার স্বপ্ন দেখতুম, কাল তোর মধ্যে তাকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর সারারাত ছটফট করেছি, ঘুমুতে পারিনি।

আমি ফুটবলের কোচ। ফুটবল খেলা শেখাই আমি। কিন্তু জানিস, আসলে প্লেয়ার তৈরি করতে পারি না আমরা। প্লেয়ার বল, শিল্পী বল, গায়ক বল, লেখক বল, সব কী এক রহস্যময় কারণে যেন জন্মগত প্রতিভা নিয়ে জন্মায়। এ তৈরি করা যায় না। যেমন হীরে। খনির ভেতর হীরে প্রাকৃতিক নিয়মেই তৈরী হয়। হীরে তৈরী করা যায় না। শুধু জহুরীর হাতে পড়লে কেটে-ছেঁটে, পালিশ তুলে সে তাকে আসল জেল্লাদার হীরের পেশ দিতে পারে। তখন তার আসল দাম। আমরাও সে রকম। আমরা ছেলেদের দোষ-ত্রুটি কেটে বাদ দিয়ে তার গুণগুলোর ওপর পালিশ চড়িয়ে তাকে একটা পরিপূর্ণ প্লেয়ার করে দিতে পারি শুধু। কিন্তু আদতে প্লেয়ারের জন্ম দিতে পারি না। তাই পৃথিবীর সমস্ত কোচরা, তা সে যে লাইনেরই হোক না কেন, একজন সত্যিকার প্রতিভার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। আমি যদি ভুল না করে থাকি, তবে তোর মধ্যে সেই প্রতিভা দেখেছি কাল। আমি তোকে একটা কমপ্লিট প্লেয়ার করে দিতে পারি। পারি, যদি এই অভাব, দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তুই জয়ী হতে পারিস, তুই যদি মনের মধ্যে জোর জমা করতে পারিস, তুই যদি আজকের কষ্টকে আগামী দিনের খুশীতে বদলে দেবার দুর্বার সাহস যোগাড় করতে পারিস, আর

যদি মনে ভাবিস, আমাকে খেলতেই হবে, খেলা ছাড়া উপায় নেই আমার, তবে। প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখ্। দেখবি. যত ছোট প্রাণীই হোক না কেন, ভগবান ঠিক তাকে বেঁচে থাকার একটা অস্ত্র দিয়েছেন। সেটা ব্যবহার করে সে বেঁচে থাকে। প্রকৃতির নিয়মকে সে অস্বীকার করে না। বাঘের গায়ে জোর দিয়েছেন বেঁচে থাকার জন্যে, আবার পিপড়েদের দিয়েছেন চরম শৃঙ্খলাবোধ। খেয়াল করে দেখলে দেখবি, আমাদের মানুষদেরও প্রত্যেককে ভগবান বেঁচে থাকার, লড়াই করার একটা অস্ত্র দিয়েছেন। আমরা যদি সেটা ঠিকমতো ব্যবহার কার, তবে আমরা বেঁচে যাবই। অমুকে লেখাপড়ায় খুব ভালো, তুই খেলায় খুব ভালো। তোকে খেলা ছেড়ে জোর করে লেখাপড়া শিখতেই হবে এর কি মানে আছে? প্রকৃতি চান, তুই খেলাটাকে তোর বেঁচে থাকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার কর্। এই সত্যটুকু যদি মনে মনে উপলব্ধি করতে পারিস, তবে তুই একদিন বড় হবিই, দাঁড়িয়ে যাবিই। তোদের বাড়ির আজকের বিড়ম্বনাকে কালকের আড়ম্বরে পালটে দিতে পারিস।

যদি তুই এইরকম মনে করিস, তবেই অবশ্য। যদি তুই মনে করিস এ-ই তোর শেষ হাতিয়ার, এ-ই দিয়ে তোর বাবা, মা, ভাই-বোনকে বাঁচাতে হবে, এ-ই দিয়ে তোর আশেপাশের লোকেদের, তোর বন্ধু-বান্ধবদের স্বপ্নকে রক্ষা করতে হবে। আসলে তুই তোর একার নোস, তুই দেশেরও। এইভাবে যদি ভাবতে পারিস, তবে আমি কথা দিতে পারি, তোকে আমি একদিন পরিপূর্ণ খেলোয়াড় করে তুলতে পারি।

কিন্তু তুই যদি মনে করিস তুই তোর একার, তোকে ভগবান যে প্রতিভা দিয়েছেন সে তোর একার প্রভাবপ্রতিপত্তি আর সুখের জন্যে, তবে তুই খুব বেশী দূর যেতে পারবি না। তোকে আমি বিদেশের অনেক বড় বড় প্লেয়ারের জীবনী দেব। পড়ে দেখিস।

প্রতিভা ছাড়া আর যে ইন্ধন তাদের বড় করেছে তা হ'লো তাদের নৈতিক জোর। তোর যদি নৈতিক জোর না থাকে, তাহলে তুই খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবি, লড়াই করার জোরটা পাবি না। আমাদের দেশে বহু প্লেয়ার এইভাবে নষ্ট হয়ে গেছে আমার চোখের সামনে। ছোট ছোট লোভ আর স্বার্থের চোরা-বালিতে কিছু দূরে যাবার পরই পা আটকে গেছে।

॥ সাত ॥

বাঁকা হরির চোখ চকচক করছিল। একটা বুক-ভাঙ্গা কষ্ট ও নিভৃতে বুকের মধ্যে চেপে যেতে চাইছিল। বলল, এটাই খুব ভালো হ'লো রে। তোকে একদিন অনেক বড় প্লেয়ার হতে হবে। এই এঁদো মাঠে তুই পড়ে থাকবি কেন? গণেশদা তোকে তাঁর ক্লাবে নিতে চাইছেন, এটা একটা সুযোগ।

একটা দলা-পাকনো কষ্ট বুক থেকে উঠে আমারও গলার কাছে উশখুশ করছিল। কোনমতে বললাম, না, আমি পারব না—

বাকা আমাকে চুপ করিয়ে দিল—কী বোকা! তুই কি চিরকাল এই এঁদো মাঠে পাঁচ নম্বর বল পিটবি নাকি?

মুখ থেকে জোর করে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, হ্যাঁ, তা-ই চাই। কে চায় তোর বড় হতে! বড় হওয়ার ইচ্ছা থাকে, তুই যা, পিনকু যাক, মানকে যাক। আমাকে তাড়াচ্ছিস কেন? আমি যাব না। এই মাঠ ছেড়ে আমাকে কোথাও যেতে বলিস না রে বাঁকা! তুই জানিস না, এই মাঠ আমার কতখানি, এই এঁদো কাদা-ওঠা গঙ্গার পারের মাঠ আমার কতখানি। আমার শয়নে-জাগরণে অনুক্ষণ আমি যার স্বপ্ন দেখি তা এই এঁদো মাঠের, আর ঐ পাঁচ নম্বর

ফুটবলের। এই মাঠ আমাকে কতখানি দিয়েছে আমি ভুলব কি করে? বাড়ির ঐ অভাব-কষ্ট থেকে প্রথম মুক্তি দিয়েছিল আমাকে এই মাঠই। সেই মাঠকে আমি ভুলে যাব? ছেড়ে চলে যাব?

তাছাড়া তোদের আমি ভুলব কি করে বাঁকা! আমি বল নিয়ে এগোচ্ছি, আমার বাঁ পাশে পিন্‌কু নেই, ডান পাশে ছেনো নেই, লাইনের ধারে তুই দাঁড়িয়ে নেই, এ যে আমি ভাবতেও পারি না! তুই বিশ্বাস কর্ বাঁকা, তাহলে আমি খেলতেও পারব না। তোদের ছেড়ে আমি চলে যাব বড় হতে? কে চায় বড় হতে!

কিন্তু এসব কথার বদলে আমার বন্ধ হয়ে যাওয়া গলা থেকে শুধু ঘড়ঘড় করে ক'টা কথা বেরিয়ে এলো, তোদের ছেড়ে গেলে আমার খেলাও নষ্ট হয়ে যাবে।

বাঁকার নিজের ঠোঁট কাঁপছিল থরথর করে। আমি লক্ষ্য করেছি। ও দাঁত দিয়ে চেপে সামলাল নিজেকে। বলল, আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিস, এ কথা তোকে কে বলল? আমরা কি সব মরে যাব নাকি? তুই যেমন আছিস, আমরাও তেমন থাকছি। তুই এখানে সময় পেলে আসবি। আমরাও মাঝে মাঝে তোর সঙ্গে দেখা করতে যাব। আর আমাদের ইলেভেন বুলেট ক্লাব থেকে যদি একটা ছেলে খুব বড় প্লেয়ার হতে পারে, তবে সেটা তো আমাদের গর্বই! অন্তত ক্লাবের মুখ চেয়েও তোর বড় ক্লাবে যাওয়া উচিত। তুই একদিন বড় হলে লোকে যা-ই বলুক, আমরা তো জানব, তুই আদতে আমাদের ইলেভেন বুলেটের প্লেয়ার!

আমি বললাম, যুক্তি-তর্ক দিয়ে অনেক কিছু বোঝানো যায় বাঁকা। কিন্তু মন মানে না।

বাঁকা ধমক দিয়ে বলল, তোকে এখন অত মন নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। যে করে হোক, এখন বড় প্লেয়ার হবার দিকে মন দে। মনে রাখিস, তুই বড় প্লেয়ার হতে পারলে তোদের বাড়ির দুঃখ ঘুচবে।

এইটা আমার বড় দুর্বল জায়গা। বাঁকা জানে। কিন্তু খেলে কি বাড়ির দুঃখ দূর করা যায়? হায় ভগবান! তুমি আমাকে ভালো খেলার গুণ দিলে কেন? ভালো মাথা দিতে পারলে না! তাহলে তো আমি টপাটপ পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে একটা ভালো চাকরি পেয়ে যেতে পারতাম।

বাঁকা বলল, তুই গণেশদাকে বলেছিস ওঁদের ক্লাবে যাবি না?

আমি মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে আছি। আমার পায়ের নীচে আমার সেই এঁদো মাঠ যেখানে আমার পায়ের চুম্বকটা আমি আবিষ্কার করেছিলাম। গঙ্গার পাড় থেকে তির তির করে হাওয়া বইছে।

বাঁকা বলল, কি, কথা বলছিস না যে?

আমার চমক ভাঙল—অ্যাঁ, কি বলছিস?

—গণেশদাকে কি বলেছিস?

আমি মিনমিনে গলায় বললাম, বলেছি, 'বাঁকাকে জিজ্ঞাসা না করে আপনাকে কথা দিতে পারছি না।'

বাঁকা ঝাঁঝিয়ে উঠল,—বাঁকাকে জিজ্ঞাসা না করে আপনাকে কথা দিতে পারছি না! বাঁকা কি তোর মনিব?

আমি হেসে ফেললাম,—হ্যাঁ, মনিব।

রাগলে বাঁকামুখো হরিকে অপূর্ব লাগে।

—হুঁ। যত্তো সব! নে, এখন চল্।—বাঁকা উঠে পড়েছে।

আমি অবাক—কোথায়?

—গণেশদার বাড়ি।

বাঁকা তারপর আমার অনুমতি না নিয়েই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করল। অগত্যা কি করি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও খোঁড়াটার পিছু নিলাম। আর যা-ই করা যাক, বাঁকা হরির অবাধ্য হওয়া যায় না।

॥ আট ॥

শুরু হ'লো আমার সাধনা।

এখন কখনো সেইসব দিনের কথা মনে হলে গায়ে কাঁটা দেয়। কী অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে গেছি সেই সময়! পরিশ্রম শুধু আমারই নয়, পরিশ্রম গেছে গণেশদারও। মনে আছে, প্রথম দু'মাসেই আমার শরীর অর্ধেক হয়ে গেছিল। আট কেজি ওজন কমে গেছিল আমার।

আস্তে আস্তে গণেশদার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠেছিলাম আমি। প্র্যাকটিস করতে করতে গণেশদা যত আমার খেলা দেখতেন তত অবাক হয়ে যেতেন।

বলতেন, আরে, দাঁড়া দাঁড়া, এই ডজটা তুই শিখলি কোথা থেকে?

আমি অবাক,—কেন, নিজের থেকে!

খেলতে খেলতে আরও হয়ত বললেন, বডির এই ট্যাকলিং তুই কোথা থেকে পেলি?

আমি লজ্জায় লাল—কেউ শেখায়নি গণেশদা।

আবার হয়ত একদিন খেলার শেষে বললেন, কোণাকুণিভাবে না পারলে আড়াআড়ি ডিফেন্স ভাঙ্গা যায় এই বুদ্ধি তোর মাথায় কে দিল?

নিজের কৃতিত্বে আমি নিজে চুপ। এই ব্যাপারগুলো যে খুব কৃতিত্বের তা আগে বুঝতাম না। গণেশদা বলতেন, জানিস, বড় বড় প্লেয়াররা যে কায়দাগুলো রপ্ত করার জন্যে বছরের পর বছর নীরবে সাধনা করে, সেগুলো তুই জন্মগত কবচ-কুণ্ডলের মতো সঙ্গে নিয়ে জন্মেছিস। তুই বোধহয় জন্মেছিস ফুটবলের মানসপুত্র হয়ে। তোকে:

বলেছিলাম, সব মানুষেরই একটা নিজস্ব ক্ষেত্র থাকে। ফুটবল তোর নিজস্ব ক্ষেত্র।

খেলার শেষে মাঠে অন্ধকার নেমে আসত। সব ছেলে বাড়ি চলে যেত। গণেশদা সাইকেল হাতে আমার পাশাপাশি হাঁটতে থাকতেন। বলতেন, তোকে আমার শেখাবার কিছু নেই। শুধু তোর মধ্যে কিছু গ্রাম্যতা আছে, সেটা শুধরে দিতে হবে। আর কিছু টেকনিক্যাল দোষ-ত্রুটি আছে।

আমি আগ্রহের সঙ্গে বলতাম, আমার খেলায় কি দোষ আছে গণেশদা ?

গণেশদা হাসতেন,—নিজেই জানতে পারবি আস্তে আস্তে। তুই বড্ড বেশী ড্রিবলিং করিস। ওতে খেলার স্পীড নষ্ট হয়ে যায়।

আগে ভাবতুম পায়ে বল নিয়ে চার-পাঁচজনকে কাটাতে পারাটাই বুঝি ভালো খেলা। ঐভাবে যখন খেলতুম, তখন লাইনের ধার থেকে প্রচুর উৎসাহ পেতাম। এখন বুঝি, বলকে মুহূর্তে ঠিক পজিশানে যে পাঠিয়ে দিতে পারে, সে-ই বড় প্লেয়ার।

সাইকেলের পাশে হাঁটতে হাঁটতে আমি গণেশদার বাড়ি অবধি যেতাম। গণেশদা আমাকে পৃথিবী-বিখ্যাত প্লেয়ারদের জীবনী এনে দিতেন। আমি ইংরেজী পড়তে পারতুম না। ইংরেজী বই-গুলো থেকে নিজের হাতে ওগুলি অনুবাদ করেছিলেন গণেশদা। সাইক্লোস্টাইল করে অনেক কপি বানিয়ে রাখতেন। তাঁর প্রিয় শিষ্যদের পড়তে দিতেন।

রাত্রে বাড়ি ফিরে সেই বই পড়তে পড়তে গায়ে শিহরণ জাগত। পরদিন সকালে আবার নতুন উত্তেজনা নিয়ে মাঠে হাজিরা দিতাম।

আস্তে আস্তে কবে যেন গণেশদার প্রিয়তম শিষ্য হয়ে উঠেছিলাম আমি। শুধু বিকেলের পাঠ নয়, গণেশদা এবার আমাকে নিয়ে সকালেও পড়লেন। তখন শুধু আমি একা। আমি আর গণেশদা। ভোর পাঁচটায় উঠে গণেশদার বাড়ি চলে যেতাম। গণেশদার

বাড়ির পাশে একটা ছোট মাঠে গণেশদা আমার জন্য অপেক্ষা করতেন। তারপর শুরু হ'তো আমার ফুটবলের আসল পাঠ নেওয়া। ফুটবলের দুরূহ পাঠগুলো নেওয়া শুরু হ'লো আমার। আস্তে আস্তে আমি তৈরি হতে লাগলাম।

এই সময় গণেশদাকে আমার কেমন হিংসুটে-হিংসুটে মনে হ'তো। গণেশদা যেন এই বিদ্যাগুলো শুধু এত দিন আমার জন্যই গোপনে আড়াল করে রেখেছিলেন। কই, বিকেলে মাঠে গণেশদাকে তো অন্য ছেলেদের এইভাবে শেখাতে দেখিনি।

আবার কখনো মনে হ'তো, গণেশদা আসলে কুমোরটুলীর সেই শিল্পী। খড়ের একটা প্রতিমা ছিলাম আমি। গণেশদার কথামতো হয়ত ওটাই আমার ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা। গণেশদা আস্তে আস্তে দিনে দিনে তাতে মাটি চড়াচ্ছেন। তিল তিল করে গড়ে তুলছেন আমার শরীর। আমার এক-একটা অংশে মাটি দিচ্ছেন, আর দূরে সরে গিয়ে দেখছেন নিজের সৃষ্টি ঠিকমতো হ'লো কি না। ঠিক কুমোরবাড়ির কুমোর যেমন করে। কখনো গণেশদা খুশী হতেন। আমার পিঠ চাপড়ে দিতেন। বলতেন, তুই সত্যি জিনিয়াস!

আবার কখনও বিরক্তি ও হতাশায় ভেঙ্গে পড়তেন। একটা টেকনিক্যাল শট, ঠিক যেভাবে গণেশদা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, আমি হয়ত সেটা কিছুতেই রপ্ত করতে পারছি না। গণেশদা রেগে উঠতেন। বলতেন, তুই একটা গাধা, তোর কিস্যু হবে না। শুধু শুধু তোর জন্যে সময় নষ্ট করছি।

আমার বার বার কুমোরের উপমাটা মনে পড়ত। দূরে দাঁড়িয়ে কুমোর দেখল, এইমাত্র যে মাটিটা প্রতিমার গায়ে চড়ানো হ'লো, সেটা ঠিকমতো হ'লো না। বিরক্ত হয়ে সে যেমন ফিরে এসে সেই অংশের মাটি ভেঙ্গে ফেলে, গণেশদা ঠিক সেইভাবে আমার খেলার বেঢপ অংশগুলো নিষ্ঠুর হাতে ভেঙ্গে দিতেন।

তারপর হয়ত সেই শটটা ঠিক শিখে নিলাম আমি। একশোটার মধ্যে সত্তরটাই ঠিক মারলাম। তখন গণেশদার আনন্দ দেখে কে! সাতদিনের চেষ্টার পর আমি নয়, যেন গণেশদাই সফল হয়েছেন। এইভাবে দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরতেন। সেই সময় তাঁর চোখ ভারী হয়ে উঠত।

—তোকে ক'দিন খুব বকেছি, না রে? ক্ষমা কর্ আমাকে!

উত্তরে আমি গণেশদাকে টুক করে প্রণাম করে ফেলতাম।

পাঁচটা থেকে সাতটা অবধি চলত আমাদের সেই নিভৃত সাধনা।

নিভৃত বলাটা বোধহয় ঠিক হ'লো না। আর একজন এসে তখন মাঠের বাইরে বসে থাকত সেই সকাল পাঁচটা থেকে। আমার সাফল্যে গণেশদার চেয়ে সেও কম খুশী নয়। গণেশদার মতো সেও আমাকে জড়িয়ে ধরত। সেই একজনের নাম বাঁকা হরি।

॥ নয় ॥

গণেশদা ছিলেন অদ্ভুত পাগল লোক। খেলা-পাগল লোক। গণেশদার ছেলে-মেয়ে নেই। কিন্তু নিজের ছেলেকেও বোধহয় লোকে এত ভালবাসে না, গণেশদা ফুটবলকে যত ভালবাসতেন। তারপর খেলার জগতে আমি আরোও অনেক মানুষ দেখেছি, দেখেছি অনেক নামী আন্তর্জাতিক বিখ্যাত কোচদের। কিন্তু কখনোই তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর ফুটবলকে উঠতে দেখিনি আমি। শুনেছি, আর একজন কোচ এমন পাগল ছিলেন। তিনি ভারত-বিখ্যাত কোচ স্বর্গত রহিম সাহেব। আমি তাঁকে দেখিনি। তবু তিনি আমার প্রণম্য।

গণেশদার গল্প শুনতাম গণেশদাব স্ত্রীর মুখে বৌদির কাছে। গণেশদার স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার ছিল সকালে প্র্যাকটিস সেরে আমি গণেশদার বাড়িতে ফিরব। সেখানেই জলখাবার খেতাম। গণেশদা একটা চটকলে ক্লার্কের কাজ করতেন। সাতটার সময় আমাকে নিয়ে প্র্যাকটিস সেরে বাড়ি ফিরে আমার সঙ্গে জলখাবার খেতেন। তারপর আবার তক্ষুণি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যেতেন অফিসে। আটটার সময় অফিসে পৌঁছাতে হ'তো তাঁকে।

আমি সকালটা গণেশদার বাড়িতেই থেকে যেতাম। আমার বই-খাতাপত্র ওখানেই থাকত। জল-খাওয়ার পর ওখানেই বই-খাতাপত্র নিয়ে বসতাম। তখন কাজের ফাঁকে ফাঁকে বৌদির সঙ্গে গল্প হ'তো। বৌদি আমাকে তাঁর ছোট ভাইয়ের মতো ভাল-বাসতেন। আমার এক-এক সময় মনে হ'তো, বৌদিও ফুটবলকে কম ভালবাসেন না। গণেশদার পাগলামির পেছনে বৌদিরও নীরব প্রশ্রয় আছে।

গণেশদা যা মাইনে পেতেন তার অর্ধেকটাই খরচ করতেন ফুটবলের পেছনে। অথচ গণেশদার নিজের সংসারও যে খুব সচ্ছল ছিল, তা নয়।

প্রতিমাসে গণেশদা বিদেশ থেকে অসংখ্য বই আর জার্নাল আনাতেন। আনাতেন ইউরোপ আর আমেরিকার প্রখ্যাত কোচরা একেবারে সম্প্রতি খেলার নতুন কি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তার উপর বিভিন্ন তথ্য।

সন্ধ্যের পর ক্লাব থেকে ফিরে গণেশদা আমাকে নিয়ে পড়তেন। তখন শুরু হ'তো গণেশদার থিওরী ক্লাস। খেলার বিভিন্ন ছক সম্বন্ধে আলোচনা হ'তো তখন। ৪-২-৪ কিংবা ৬-২-২ কিংবা ৮-২ কিংবা ৭-২-১—এইসব বিভিন্ন খেলার পদ্ধতির দোষ-গুণ নিয়ে গণেশদা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করতেন।

অবাক হয়ে যেতাম গণেশদার ফুটবলে দখল দেখে। বিভিন্ন

ছকগুলো সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এত পরিষ্কার ছিল যে, মনে হ'তো, যেন এইমাত্র তিনি মাঠ থেকে এই ছকে খেলে এলেন। খাতায় এঁকে এঁকে বিভিন্ন পদ্ধতির ডিফেন্স লাইন ভালো করে বোঝাতেন আমাকে। এবং সেই ডিফেন্স ভাঙ্গার জটিল পথগুলো আমাকে খাতায় এঁকে এঁকে বোঝাতেন।

পরদিন বিকেলে মাঠে গিয়ে ঐভাবে প্লেয়ার সাজিয়ে আমাকে ডিফেন্স ভাঙ্গতে বলতেন। কাগজে-কলমে শেখার সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে একেবারে হাতে-কলমে শেখা হয়ে যেত আমার।

গণেশদা বলতেন, খেলার সবচেয়ে ইম্পর্ট্যাণ্ট ব্যাপার কি বল্ ত ?

আমি বলতাম, ভালো খেলা।

গণেশদা মাথা নাড়তেন,—না।

আমি অবাক চোখে চাইতাম,—তবে ?

—গোল করা।

আমি আরো অবাক। ভালো খেলার চেয়ে গোল করাটা বড় কথা হ'লো ? অবিশ্বাসী গলায় বলতাম, গোল করা ?

গণেশদা বলতেন, হ্যাঁ, গোল করা। যে কোনো জিনিসের সার্থকতা হ'লো তার ফলে, তার সাফল্যে। ফুটবলের সার্থকতা গোলে।···শোন্, শোন্, তর্ক করিস না। ধর্, তোরা খুব ভালো খেললি, সারা খেলায় পাঁচটা গোল করার সুযোগ তৈরি করলি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গোল করতে পারলি না। অথচ তোদের অপোনেণ্ট তোদের চেয়ে অনেক খারাপ খেলল, সারা খেলায় একটামাত্র গোল করার মতো অবস্থা তৈরি করতে পারল, আর তাতেই গোল করে দিল। তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় ? ওরা ট্রফি পেয়ে গেল, রেকর্ড বইয়ে ওদের নাম উঠল। সেখানে তো আর লেখা থাকবে না যে, তোরা খুব ভালো খেলেছিলি, স্রেফ দুর্ভাগ্যের জন্যে জিততে পারিসনি !

দেখ্ পৃথিবী খুব নিষ্ঠুর। এখানে "সার্‌ভাইভাল অব দি ফিটেস্ট" কথাটা খুব সত্যি। এখানে আবেগটাবেগের কোনো স্থান নেই। তুমি যদি ভালো ফল দেখাতে পার, তবেই তুমি স্থান পাবে। তা না হ'লে নয়। অতএব যে করে হোক, তোকে ভালো ফল দেখাতে হবে। তা না হ'লে উপায় নেই। লেখাপড়া করলে তোকে ফার্স্ট হতে হবে, ক্রিকেট খেললে রান তুলতে হবে, আর ফুটবল খেলতে হলে গোল দিতে হবে। নান্য পন্থা।

আমি বললাম, তা হ'লে যে করে হোক একটা গোল করাই ফুটবলের শেষ কথা?

গণেশদা বললেন, বোকার মতো কথা বলিস না। শেষ কথা অবশ্যই ভালো খেলা। কিন্তু মোস্ট ইম্পর্ট্যাণ্ট ব্যাপার হ'লো গোল করা। যাক সে কথা, আজ এইসব কথা তুললাম কেন জানিস?

—কেন?

—এই গোল করাতেই আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী দুর্বলতা দেখা যায়। একটা কম্‌প্লিট ফরোয়ার্ড নেই এখন আমাদের দেশে। কেউ হয়ত খুব ভালো স্কীমার, মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে এসে গোলমুখে বল তৈরি করে দিতে পারে, কিন্তু নিজে ভালো গোল করতে পারে না। আবার কেউ হয়ত স্ট্রাইকার। তার কাজ হ'লো সারাক্ষণ গোলমুখে শকুনের মতো বসে থাকা। কখন একটা বল এসে পড়বে, আর সে গোল করবে। এসব বাবুগিরির খেলা। আজকাল কোনো প্লেয়ারকে ওভাবে স্পেয়ার করা যায় না। একটা প্লেয়ার, তার আর কোনো কাজ নেই, স্রেফ শুধু গোলমুখে হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকো! আজকাল প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে খেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা অংশে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই মুহূর্তে যে স্ট্রাইকার, পরমুহূর্তে তাকে হতে হবে হাফ-লাইনের দুর্ধর্ষ ডিফেণ্ডার। এবং ফরোয়ার্ড লাইনের প্রত্যেকটা প্লেয়ারের পায়ে থাকবে গোল করার ক্ষমতা—নিখুঁত লক্ষ্যে গোল করার ক্ষমতা।

গোল করার যে কায়দাগুলো এত দিন শিখে এসেছিল, সে সব ভুলে যেতে হবে। ওভাবে আর গোল করতে পারবি না। এর পর যখন বড় খেলায় খেলবি, দেখবি, পেনাল্টি এরিয়া ভীষণ ক্রাউডেড, পেনাল্টি এরিয়ায় ঢুকে গোল করা একেবারে প্রায় অসম্ভব। আক্রমণের মুখে আটজন প্লেয়ার দাঁড়িয়ে থাকে গোলমুখে। ওখান থেকে তুই গোল করার ফাঁক পাবি কোথায় ?

আজকাল আন্তর্জাতিক খেলায় বেশির ভাগ গোল হচ্ছে, দেখবি, হাফলাইন আর পেনাল্টি এরিয়ার মাঝখানের ছড়ানো ফাঁকা জায়গা থেকে। ওখান থেকে চকিত শটে গোল করতে হবে বিপক্ষের খেলোয়াড়রা গোলমুখে পজিশান নেওয়ার আগেই।

—কিন্তু গণেশদা, অত দূর থেকে গোল করা কি সম্ভব ?

—সম্ভব। সব কিছুই সম্ভব করতে হবে। সমস্যা যত অসম্ভব হয়ে উঠবে, তার সমাধানে তত বেশী আনন্দ। এইখানেই মানুষের জিত। কোনো কিছু অসম্ভব নেই তার কাছে।

—কিন্তু কিভাবে ?

—এবার সেটাই শেখাব তোকে।

॥ দশ ॥

এবার শুরু হ'লো আমার এক নতুন ধরনের ট্রেনিং। এক নতুন ধরনের সাধনা। হাড়ভাঙ্গা মুখে-রক্ত-তোলা এক পরিশ্রম।

গণেশদার বাড়ির পাশে সেই ছোট্ট মাঠে গণেশদা এক নতুন ধরনের গোলপোস্ট বসালেন। দেখে আমি অবাক। কিন্তু গণেশদা জার্নাল খুলে দেখালেন, ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। ঐভাবেই এখন খেলা হচ্ছে বাইরে।

সমস্ত গোলপোস্টটা কুড়ি ভাগে ভাগ করলেন গণেশদা। এক-একটা ভাগে একটা করে লোহার রিং ঝোলানো হ'লো। রিংগুলোর নম্বর দেওয়া হ'লো এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত। গণেশদা এবার কাগজে এঁকে দেখালেন কোন্ পজিশান থেকে ঠিক কোন্ রিং-এর ভেতর দিয়ে গোল করতে হবে।

শুরু হ'লো আবার প্র্যাকটিস। গণেশদা বল গড়িয়ে দিতেন, সেণ্টার লাইন থেকে বল নিয়ে দৌড় শুরু করতাম আমি। সেণ্টার আর হাফলাইনের মাঝামাঝি এসে চলতি বলে চকিতে শট মেরে গোল করার চেষ্টা করতাম। গণেশদা বলতেন, এবার ষোলো নম্বর রিং দিয়ে গোল কর্।

সেইভাবে শট মারতাম আমি। ষোলো নম্বর তো দূরের কথা, কোনো রিং দিয়েই গোল হ'তো না। রিং-এর গায়ে লেগে বল ফেরত চলে আসত। বল লেগে সব ক'টা রিং দুলতে শুরু করত।

আমি যত ব্যর্থ হতে লাগলুম, গণেশদার জেদ তত বাড়তে লাগল। বললেন, এই পরীক্ষায় তোকে পাস করতেই হবে যেভাবে হোক। আর যদি করতে না পারিস, তবে চিরকালের মতো তোর খেলা বন্ধ করে দেব।

জেদ চেপে বসল আমারও। বিকেলে মাঠে যাওয়াও ছেড়ে দিলাম। দিনরাত গণেশদার পাশের মাঠে পড়ে থাকতাম, আর একটা বল নিয়ে ছুটে গিয়ে গোল করার চেষ্টা করতাম। প্রত্যেক-বারই অব্যর্থভাবে ব্যর্থ হতাম।

প্রথম প্রথম মাঠের চারপাশে কিছু লোক জমে যেত। এ আবার কী রকমের খেলা রে বাবা! আমি গোল করার চেষ্টা করছি, অথচ একটাও গোল হচ্ছে না দেখে লোকগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসত। তারপর একদিন বিরক্ত হয়ে ওরা চারপাশে এসে দাঁড়ানো বন্ধ করে দিল। বাইরে রটে গেল, পাগলা গণশা এত দিনে এক পাগলা চেলা তৈরি করতে পেরেছে কী এক আজব

গোলপোস্ট তৈরি করে ছেলেটা দিনরাত সেখানে এক একা বল পেটাচ্ছে।

আমি খেলতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। এত দিনে আমার কিছু কিছু শুভানুধ্যায়ী তৈরি হয়ে গেছিল। তারা এসে আমাকে বলত, এ কী পাগলামী শুরু করেছ! তোমার নিজের খেলাটাও যে ভুলে যাবে এর পর! গণশাটা এককালে খেলত ভালো, এখন খেলাটা শেখায়ও ভালো। কিন্তু ওর মাথায় ছিট আছে। তোমার সর্বনাশ করছে। কাল থেকে আবার মাঠে এসো।

এসব কথা আমার এক কান দিয়ে ঢুকত, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যেত। আমার নিজের ভেতরে একটা পরিবর্তন আসছে, আমি টের পাচ্ছিলাম। আমি আসলে খুব অধৈর্য প্রকৃতির ছেলে। কোনো ব্যাপার দু-চার দিনের মধ্যে রপ্ত করতে না পারলে আমি অধৈর্য হয়ে পড়ি, বিরক্তিতে ভেঙ্গে পড়ি। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে দেখছি, আমার ভেতরে কেমন একটা অন্তহীন জেদ তৈরী হচ্ছে। যত ব্যর্থ হচ্ছি, তত বেশি করে সেই জেদটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

মাঠে তখন মানুষ দাঁড়ানো বন্ধ হয়ে গেছিল। গণেশদা সকালে অফিসে চলে যেতেন। আমি একা একা মাঠে বল নিয়ে প্র্যাকটিস করতাম। সেই অসম্ভবের সাধনায় মগ্ন আমি। এই সময় একদিন খুব একটা মজার ব্যাপার ঘটল। এক-এক সময় মনে হয়, আমার সেই সাধনার সাফল্যের মধ্যে বোধহয় কোনো এক জায়গায় এই ব্যাপারটারও একটা গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা আছে।

ঐ ছোট্ট মাঠের পাশে আমাদের গোলপোস্টের পিছনে ছোট্ট সাদা রঙের একটা গ্রীল-দেওয়া বাড়ি ছিল। বাড়ির সামনে ছোট্ট সুন্দর একটা বাগান। খুব সুন্দর গোলাপ আর বাটির মতো বড় বড় হলুদ গাঁদা ফুল ফুটে থাকত সেই বাগানে। গোলে শট মারা প্র্যাকটিস করতে করতে এক-এক সময় বল গিয়ে ঐ বাগানে পড়ত। একটা ছোট্ট ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলটা আবার ছুঁড়ে মাঠে

পাঠিয়ে দিত। আবার আমি প্র্যাকটিস শুরু করতাম। এইভাবে বেশ চলছিল।

একদিন প্র্যাকটিস করতে কবতে আবার গিয়ে বাগানে বল পড়ল। আমি মাঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি কখন সেই ছেলেটি বেরিয়ে এসে বলটা ফেরত দেবে। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম, এবার ছেলেটি নয়, তার বদলে একটি বড় মেয়ে বলটা হাতে নিয়ে গেট খুলে মাঠে এলো। বলটা হাতে নিয়ে বেশ গম্ভীর মুখে মেয়েটি আমাকে কাছে ডাকল। মেয়েটিকে আমি চিনি। আমারই বয়সী। দশটার সময় বেণী দুলিয়ে স্কুলে যায়। ক্লাস সেভেনে পড়ে। নাম দীপা।

কিন্তু আমার বয়সী স্কুলে-পড়া মেয়ে হ'লে কি হবে, ওর গম্ভীর থমথমে মুখ দেখে আমি ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম। আড়ষ্ট পায়ে আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি, মেয়েটির ফরসা মুখ রাগে লাল টকটকে হয়ে আছে।

আমি কাছে যেতে বলল, এই নিন বল। কিন্তু এ-ই শেষবার। ফের যদি বল গিয়ে আমাদের বাগানে পড়ে, তবে আর ফেরত পাবেন না। সেটাই বলতে এলাম।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, কেন?

মেয়েটি বলল, কেন! একবার আমাদের বাগানটা গিয়ে দেখে আসুন, তাহলে বুঝবেন। আপনার খেলার উৎপাতে আমার সমস্ত বাগান তছনছ হয়ে গেছে।

বলে মেয়েটি আমার দিকে বলটা ছুঁড়ে দিয়ে গটগট করে ফিরে গেল বাড়িতে।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এবার কি করব? আবার যদি বল গিয়ে পড়ে? ঐ মেয়ের যা মূর্তি দেখলাম তাতে স্পষ্ট যে, সত্যি সত্যি আর বল ফেরত দেবে না। আমি মাঠে বল নিয়ে বসে পড়লুম। কি করি? এখন বাড়ি যেতেও ইচ্ছে করছে না। আজকাল

আমার এই মাঠ ছেড়ে কোথায়ও যেতে ইচ্ছে করে না। এই মাঠ, এই বল, আর ঐ আজব গোলপোস্ট আমাকে ঘোরের মতো পেয়ে বসেছে। আমি বুঝতে পারি, আমার নিয়তি এই তিনটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। মুক্তি নেই। কবে ভেদ করতে পারব ঐ গোল? এই জীবনে কি পারব? অর্জুনের মাছের চোখের লক্ষ্যভেদের কথা শুনেছি। সে কি এর চেয়েও কঠিন ছিল? বোধ হয় ছিল না। কী অসম্ভব দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের মতো গোল-পোস্টটা আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে! এক-একদিন রাগে অন্ধ হয়ে দৌড়ে ছুটে গিয়ে লাথি মেরে ওটা ভেঙ্গে ফেলতে ইচ্ছে করে। হতাশায় বসে পড়ি মাঠে। কিন্তু দু'মিনিট পর আবার অদৃশ্য নিয়তির টানে ক্লান্ত শরীরটা টেনে উঠে পড়ি। পায়ে পায়ে বল নিয়ে চাঁকিতে শট মারি। পোস্টে লেগে ফিরে আসে। না, আমার মুক্তি নেই। আসলে গণেশদা যতই আমাকে উৎসাহ দিন, সান্ত্বনা দিন, প্রবোধ দিন, আমি আসলে খুব সাধারণ স্তরের একজন খেলোয়াড়।

মাঠে বসে বসে এইসব সাত-পাঁচ ভাবছিলাম। কতক্ষণ কেটে গেছে, কে জানে! বোধহয় ঘণ্টা দুয়েক হবে। দশটা বাজে। সেই মেয়েটি গেট খুলে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। স্কুলে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো মাঠে।

এখন তার মুখে আর রাগ নেই। তার বদলে একটা চাপা হাসি উঁকি মারছে। কিন্তু গম্ভীর মুখ ভেদ করে সেটা বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে না।

—খেলা একেবারে বন্ধ করে দিলেন কেন?

—না, মানে বাগান।.....

ঠোঁটের আশেপাশে আর একটু হাসি ভাঙ্গল,—আমি আপনাকে খেলা বন্ধ করতে বলিনি তো। একটু সাবধানে খেলতে বলেছি।

আমার এবার একটু রাগ হ'লো। নিজে খেলা বন্ধ করে দিয়ে এখন আবার সহানুভূতি দেখাতে আসা হয়েছে!

—খেলার কথা বলা যায়? যে কোনো সময় আবার গিয়ে বল বাগানে পড়তে পারে।

—তার মানে আমাদের বাগানের জন্যে আপনার খেলা বন্ধ?

আমি থমথমে মুখে বললুম, অগত্যা।

মেয়েটি এবার পুরোপুরি হাসল। হাসলে ওর চোখদুটো ঝলমল করে ওঠে দেখলাম। বলল, বাগানের যা সর্বনাশ করার তা তো করেছেন। এখন আর খেলা বন্ধ করে লাভ কি? আপনি খেলুন। ততদিন আমার বাগান করা বন্ধ থাকবে।

বলে মেয়েটি চলে গেল। আমি পেছনে দাঁড়িয়ে রইলাম ওর হাঁটার দিকে চেয়ে। কি হ'লো ব্যাপারটা? এই কিছুক্ষণ আগে খেলা বন্ধ করে দিয়ে গিয়ে এখন আবার বলা হচ্ছে খেলা হোক! গণেশদা মাঝে মাঝে বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করে এসে বলেন, মেয়েদের চেনে কার সাধ্য!

কথাটার মানে তখন বুঝতাম না। এখন কিছুটা বুঝতে পারছি।

এর পর থেকে দীপা মাঝে মাঝে এসে ওদের জানালায় দাঁড়াত। তখন স্বভাবতই আমার খেলার উৎসাহে একটা বাড়তি শক্তি এসে যোগ হ'তো।

আস্তে আস্তে দীপার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। দীপা স্কুলে যাওয়ার সময় রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করত, আজ ক'টা রিং ভেদ করলেন?

আমি তখন সেন্টার লাইন থেকে বল নিয়ে কোণাকুণি হাফ-লাইনে ঢুকছি শট করার জন্যে। চেঁচিয়েই উত্তর দিতাম, একটাও নয় দীপা।

দীপার উৎসাহ কিন্তু আমার চেয়ে বেশী। বলত, স্কুল থেকে ফিরে যেন শুনি, দুটো রিং-এ গোল করতে পেরেছেন।

দুম করে শট করে আমি বলতুম, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক দীপা।

দীপা দাঁড়িয়ে পড়ে ছদ্মকোপে বলত, আপনি আমাকে মেরে ফেলতে চাইছেন!

আমি গোল লাইন থেকে বল নিয়ে ফিরতে ফিরতে অবাক গলায় বলতাম, বাঃ, তোমায় আবার মেরে ফেলতে চাইলাম কখন্?

দীপা হাসতে হাসতে চেঁচাত রাস্তা থেকে,—মরলেই তো মানুষের মুখে ফুল-চন্দন পড়ে বাবা!

॥ এগারো ॥

ছ-মাসের মাথায় আমি প্রথম রিং-এ লক্ষ্যভেদ করতে পারলুম। হাফ লাইন আর পেনাল্টি লাইনের মাঝামাঝি একটা জায়গা থেকে আমি কোণাকুণি গোল করতে পারলুম। আমি আনন্দে দিশাহারা। ব্যাপারটা ঘটল সকালের দিকে। ভাবলুম, বিকালে গণেশদা ফিরলে কথাটা বললে কী অভিনন্দনের ঘটাই না পড়বে!

আমি লক্ষ্য করলুম, ঐ জায়গা থেকে আমি দশটার মধ্যে চারটে বলই ছয় নম্বর রিং-এ ঢোকাতে পারছি।

বিকেলে গণেশদা মাঠে আসতে আমি লাফাতে লাফাতে ভাঙ্গলাম কথাটা। কিন্তু গণেশদার মধ্যে কোনো উনিশ-বিশ দেখা গেল না। গণেশদা বললেন, কই, মেরে দেখা তো।

আমি শুরু করলাম। ছমাসের একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফসল। দশটার মধ্যে চারটে রিং ভেদ করল।

আমি গণেশদার দিকে তাকালাম। এবার নিশ্চয়ই জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু গণেশদা ওসবের ধার দিয়েও গেলেন না। গম্ভীর মুখে বললেন, টোটাল সাক্সেসের শতকরা পাঁচ ভাগ রপ্ত করেছিস। এখনও পঁচানব্বুই ভাগ বাকী। সেটা মনে রেখে আদা-জল খেয়ে আবার লেগে পড়্। আহ্লাদের কিছু নেই।

—পঁচানব্বই ভাগ!

—হ্যাঁ, পঁচানব্বই ভাগ। এখন শুধু একটা রিং-এ মারতে পারছিস। এখনও উনিশটা রিং বাকী। সমস্ত গোলপোস্টের কুড়িটা রিং তোর মাথায় আঁকা হয়ে যাবে। বল নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আমি ঠিক যে নম্বর রিং বলব সেই রিং-এ গোল করতে হবে—মাথা না তুলে, গোলের দিকে না তাকিয়ে। যেন চোখ বেঁধে দিলেও তুই ঠিক সেই রিং দিয়ে গোল করতে পারিস। সেদিন আহ্লাদে করিস।

আমি মাঠে বসে পড়লুম।

গণেশদা বললেন, কি রে, বসে পড়লি যে? ওঠ্, শুরু কর্, সময় নেই।

—হবে না গণেশদা।

—হবে না?

—তোমার মাথা খারাপ গণেশদা। একটা রিং—এই দশটার মধ্যে চারটে মারতে লাগল ছমাস। এবার হিসাব কর। বাকী উনিশটা রিং-এ দশটার মধ্যে আটটা গোল, তাও আবার চোখ বেঁধে—ক বছর সময় লাগবে? আমার এই একটা জীবনে কুলোবে না।

গণেশদা এবার হাসলেন। বললেন, না রে, অত সময় লাগবে না। প্রথমটা আয়ত্তে আসতেই যা সময় লাগে। আর খুব জোর বছর দেড়েক সময় লাগবে। নে, উঠে পড়, শুরু কর্।

আমি মাটিতে ভর দিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালাম। গণেশদা বল এগিয়ে দিলেন সেণ্টার লাইন দিয়ে। আমি নিয়ে ছুটলাম হাফ-লাইনের দিকে।

গণেশদা চেঁচালেন—ষোলো নম্বর।

আমি দ্রুত বাঁ পায়ে শট নিলাম।

কী আশ্চর্য! বল ষোলো নম্বর রিং একটুও না কাঁপিয়ে ভেতরে চলে গেল।

গণেশদা আকাশ কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—হুররে!

তারপর ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

আমি এতক্ষণ এই আদরটুকুর অপেক্ষায় ছিলাম।

॥ বারো ॥

আট-আটটা বছর কেটে গেছে। এখন মনে হয়, যেন এই সেদিনের কথা। এই সেদিন আমি ইলেভেন বুলেটের হয়ে খেলতে গেছিলাম নেতাজীর মাঠে, আর তারপর গণেশদা এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। তখন ক্লাস সেভেনে পড়তাম। আর এখন হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে বসে আছি তিন বছর আগে। না, তারপর আর পড়াশুনা করিনি। পড়াশুনা আর আমার মাথায় কুলোচ্ছে না। সেদিন আমি ছিলাম বারো বছরের এক ছোট্ট কিশোর ছেলে। আজ আমি কুড়ি বছরের যুবক। ভাবলে এক-এক সময় অবাক লাগে। দিন কি ভাবেই না কেটে যায়!

হাসপাতালের বেডে শুয়ে সব সময় এইসব সাত-পাঁচ কথা মনে পড়ে। পৃথিবী ঘুরতেই থাকে সূর্যের চারপাশে, সময় চলতেই থাকে। সে-ই হেরে গেল, যে সময়ের সঙ্গে ছুটতে না পারল।

এক-এক সময় মনে হয়, আমিও কি হেরে গেলাম? কুড়ি বছর বয়স হ'লো জীবনটার, অথচ কী করতে পারলাম? গণেশদা যতই সান্ত্বনা দিন, যতই প্রবোধ দিন, আমার মন মানতে চায়

না। গণেশদা বলেন, আমি নাকি ফুটবলের জিনিয়াস। রেয়ার ট্যালেণ্ট।

হয়ত তা-ই। কিন্তু জিনিয়াস আর ট্যালেণ্ট ধুয়ে আমি কী জল খেলাম। কিছুই করতে পারলাম না আমি। বহুদিন আগে গণেশদা যেমন বলেছিলেন, ফুটবল খেলার সবচেয়ে ইম্পর্ট্যাণ্ট ব্যাপার গোল করা, ভালো খেলা নয়, তেমনি জীবনের সবচেয়ে ইম্পর্ট্যাণ্ট ব্যাপারও জিনিয়াস বা ট্যালেণ্ট নয়, বোধহয় গোল করাটাই। জীবনে আমি একটাও গোল করতে পারলাম না।

নার্স এসে এক গ্লাস দুধ দিয়ে গেল। দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে চুমুক দিলাম ছোট করে। হাসপাতালের এরা যে কোথা থেকে দুধ যোগাড় করে, কে জানে! দুধে এমন একটা বোঁটকা গন্ধ যে, অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসতে চায়। নাক চেপে জোর করে দুধটা খেলাম।

ঘড়ি দেখছি আড়চোখে কখন্ চারটে বাজবে। ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু হবে। গণেশদা রোজ আসেন। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা কলকাতার এই মেডিকেল কলেজে। মাও রোজ আসেন। সঙ্গে কোনোদিন ঝণ্টু, কোনোদিন উমা থাকে। মা প্রথম প্রথম বেশ ভয় পেয়ে গেছিলেন, এখন অনেকটা সামলে নিয়েছেন। আর আসে দীপা। ওর আর ক'দিন পরে বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষা। আমি ওকে আসতে মানা করি। ও কথা শোনে না। ও নির্ঘাত এবার ফেল করবে।

আজ তিন মাস হ'লো পা ভেঙ্গে হাসপাতালে শুয়ে আছি। কারো অভিশাপ নিয়ে বোধহয় আমি খেলতে এসেছিলাম। তাই সিজ্‌নের শুরুতেই—শুধু সিজ্‌নের শুরুতেই নয়—জীবনের শুরুতেই পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে শুয়ে রইলাম।

বাবা মাঝে মাঝে প্রেস-ফেরত আসেন। বাবাকে দেখলে ভীষণ কষ্ট হয় আমার। চোখ ফেটে জল আসতে চায়। বাবার

চোখের দৃষ্টি আরো ঘোলাটে হয়েছে। শরীরে বোধহয় আর এক ফোঁটাও রক্ত নেই বাবার। এক-এক সময় আফসোস হয়। নিজেকে অপরাধী মনে হয় আমার। খেলার জন্যে শুধু শুধু এতগুলো বছর নষ্ট করলাম। আমি গরীবের ছেলে। এর চেয়ে যদি মন দিয়ে লেখাপড়াটা করতাম ছোটবেলা থেকে, তবে এত দিনে কোনোমতে বি এ.-টা নিশ্চয়ই পাস করতে পারতাম। তারপর টাইপ-শর্টহ্যাণ্ড শিখে একশো টাকা মাইনের একটা কাজ বোধহয় জোটাতে পারতাম। কিন্তু কোথা দিয়ে কী যে হয়ে গেল!

এ বছরে কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাব খিদিরপুরে নাম লিখিয়ে দিয়েছিলেন আমার গণেশদা। আমার খেলা দেখে ওরা সাদরেই গ্রহণ করল আমাকে। গণেশদা বলেছিলেন, ওখানে এক বছর খেল্। তাহলেই বড় টীমের নজরে পড়বি। আর একবার বড় টীমের নজরে পড়তে পারলে চাকরির অভাব হবে না তোর।

সেইভাবেই খেলতে গেছিলাম খিদিরপুর টীমে। কিন্তু প্রথম খেলাতেই এক অন্যায় ট্যাক্‌লিং-এর শিকার হলাম আমি। সিজ্‌নের প্রথম খেলার ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হ'লো আমাকে স্ট্রেচারে করে। যে মেরেছিল, তাকে তিন মাসের জন্য সাসপেণ্ড করা হয় পরে।, তিন মাসের মাথায় আমারও ছাড়া পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইদানীং গোড়ালিতে আর একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। বড় ডাক্তার দেখে গেছেন। আর একটা ছোটখাট অপারেশন করতে হবে বলেছেন। আগামী সপ্তাহে সেই অপারেশনটা হবে। তারপর আরো তিন মাস হাসপাতালের অব্‌জারভেশনে থাকতে হবে।

তার মানে, এই সিজ্‌নটা গেল। গেল আমার চাকরি পাওয়ার স্বপ্নও। কিন্তু চাকরি তো পরের কথা, ডাক্তারদের প্রবোধসত্ত্বেও আমার বিশ্বাস করতে মন চাইছে না যে, আমি আবার স্বাভাবিক-ভাবে খেলতে পারব কোনোদিন।

এইসব কথা ভাবলে মন বিষিয়ে ওঠে এক-এক সময়। সমস্ত পৃথিবীর উপর একটা অকারণ রাগ জমা হয় আমার। হাসপাতালের বেডটার উপর এক-এক সময় অসহ্য রাগ হয়। মনে হয়, লাথি মেরে দু'টুকরো করে ফেলি ওটাকে!

পরমুহূর্তে নিজের ছেলেমানুষিতে নিজেই হেসে উঠি। যাঃ, এটার কী দোষ? বরং এর আশ্রয় পেয়েই তো এবারকার মতো বেঁচে গেলুম। গণেশদা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঘোরাঘুরি করে এই ফ্রী বেডটা যোগাড় করেছেন। এ ছাড়া আরো অসংখ্য খরচ আছে। ওষুধের, ইন্‌জেকশনের, ফলমূলের। সব গণেশদা চালাচ্ছেন। দীপা টিউশানি করে দুশো টাকা জমিয়েছিল, সেটা একদিন চুপি চুপি মার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে।

বাঁকা হরি রোজ আসতে পারে না। ওর বাবা মারা গেছেন। এখন খাটালের পুরো দায়িত্ব ওর ওপর। তবু মাঝে মাঝে নিয়ম করে ও আসে। এসে আমার মাথার কাছে চুপ করে বসে থাকে। কোনো কথা বলে না। ও এলে আমার মনটা অনেক ভালো থাকে।

এক-এক সময় মনে হয়, কী অযোগ্য, কী বাজে আমি! এত ভালবাসা, এত স্নেহ, এত আদর পাওয়ার যোগ্য আমি নই। এত কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি শোধ করব কিভাবে? কোনোদিনই আমি কি আমার দিন ফিরে পাব না?

॥ তেরো ॥

ছ'মাসের মাথায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম আমি। সাত দিন বাড়িতে হাঁটা-চলা করার পর গণেশদা আমাকে মাঠে নিয়ে এলেন। খুব সাবধানে বল নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম আমি। অল্প

একটু দৌড়োলাম।—পারছি। অসুবিধা হচ্ছে না। গণেশদা সেই গোলপোস্টে আবার রিংগুলো টাঙিয়েছেন। ওটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছিল। ঐ বিদ্যা আমার করায়ত্ত নয়, পদায়ত্ত ছিল। একলব্যের অস্ত্রশিক্ষার মতো পরিপূর্ণতা এসেছিল আমার।

গণেশদা বল বাড়ালেন, আমি বল ধরলাম।

গণেশদা বললেন, দশ নম্বর।

আমি চকিতে ডান পায়ে শট নিলাম। দশ নম্বর রিং ভেদ করে বল চলে গেল। আমি অবাক ঃ এখনও পারছি!

গণেশদা আবার বল বাড়ালেন। আমি বল নিয়ে ছুটছি মাথা নীচু করে। গণেশদা বললেন, সতেরো।

আমি মাথা না তুলেই বিদ্যুৎগতি শট হানলাম। বাতাসও নড়ল না, কোনো রিং একটুও দুলল না, সতেরো নম্বর রিং ভেদ করে চলে গেল শুধু কালো সুতোর মতো একটা রেখা। বল বলে চেনা যায়নি তখন সেটাকে।

গণেশদা আবার বল বাড়ালেন। দুরূহ কোণে গিয়ে পড়েছি তখন, গণেশদা বললেন, পাঁচ।

এখান থেকে পাঁচ নম্বরে গোল হওয়া অসম্ভব। তবু হাঁটুর টোকায় বল তুলে দিলাম বাতাসে, তারপর নিজের শরীরটাকে বাতাসে ভাসিয়ে দিলাম আড়াআড়ি। ভাসিয়ে দিয়েই ডান পায়ে ভাসন্ত বলে ঠিকানা লিখলাম।

গণেশদা দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। শটটা মেরে আমি তখন মাটিতে পড়ে গেছি। ঐ মাটির উপর চেপে ধরেই গণেশদা আমাকে আদরে আদরে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চাইলেন।

বিকেলে গণেশদার নির্দেশমতো নেতাজীর মাঠে গেলাম। রেগুলার খেলায় অংশগ্রহণ করলাম। পুরো সত্তর মিনিট খেললাম। খেলতে খেলতেই টের পেলাম, কোথায় যেন একটা কিছু পালটে গেছে। কী, সেটা বুঝলাম না। তবে যেটা বুঝলাম তা হ'লো, বল

যেন আরো অনেক সহজে আমার পায়ে পায়ে ঘোরাফেরা করছে। অনেক হালকা লাগছে বলটাকে। আগে এত হালকা মনে হ'তো না।

খেলার শেষে গণেশদা সেটাই বললেন। গণেশদার বাসায় বসে লুচি-আলুভাজা খেতে খেতে গণেশদার কথা শুনছি। আমার দু' পায়ে নাকি এখন অনেক বেশী দীপ্তি ঝলমল করছে আগের তুলনায়।

আমি সন্দিগ্ধ: কি করে হ'লো ব্যাপারটা? গণেশদা বললেন, তোর খেলায় এত দিন প্রতিভার বিদ্যুৎ-ঝলকানি ছিল, এবার লাবণ্যের পর্দা পড়েছে তাতে। আসলে এই ছ'মাসের বিশ্রামটা শাপে বর হয়েছে তোর। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন, বুঝলি। আসলে গত আট বছর একনাগাড়ে বিরামহীন প্র্যাকটিসের ফলে তোর প্রতিভায় তুই ফুটবলের দুরূহ পাঠগুলো তুলে নিতে পেরেছিলি। কিন্তু সেগুলো তোর মধ্যে থিতোনোর সময় পায়নি। এই ছ'মাসের বিশ্রামে ফুটবল থেকে দূরে থাকায় সেগুলো থিতিয়ে বসেছে তোর মধ্যে। প্র্যাকটিসের যে যান্ত্রিকতা, সেটা কেটে গেছে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে অনেক কল্পনা-প্রবণ হয়ে উঠেছিস তুই। তোর খেলায় এখন সেই কল্পনার ছোঁয়া, লাবণ্যের ছোঁয়া। এত দিনে তুই সত্যিকারের একটা পরিপূর্ণ প্লেয়ার হয়ে উঠলি।

আমি একটা আস্ত লুচি মুখে পুরে অবাক গলায় বললাম, নাকি!

গণেশদা বললেন, ঠাট্টা নয়, সত্যি। এত দিন তোর খেলা দেখে মনে হ'তো, সব আছে তোর, কিন্তু কী যেন নেই। বুঝতে পারতাম না কিসের অভাব সেটা। আজ বুঝতে পারছি, অসম্ভব সাধনা আর পরিশ্রমের যান্ত্রিকতা পেয়ে বসেছিল তোকে। এখন সেটা কেটে গেছে। বুঝতে পারছি ঠিক কী জিনিস তোর মধ্যে দেখতে চেয়েছিলাম। এই লাবণ্য, এই কল্পনা।

বৌদি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—চুপ কর তো তুমি!—দিনরাত খেলা-

খেলা করে তুমি ছেলেটার মাথা খেলে ! নিজে যেমন পাগল, ওকেও তেমন পাগল করে তুলবে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, তোকে আর দুটো লুচি দিই ?

আমি নিরীহের মতো বললাম, দেবেন বলছেন ? দিন।

গণেশদা বললেন, আমায় ?

বৌদি রান্নাঘর থেকে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—তুমি আর পাবে না।

গণেশদা নির্লিপ্তভাবে আমার পাত থেকে একটা লুচি তুলে নিলেন।

আমি ক্ষুব্ধ গলায় বললাম, এটা কী হ'লো গণেশদা ?

গণেশদা গম্ভীর মুখে বললেন, গুরুদক্ষিণা !

আমি আবার পুরোপুরি খেলার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিলাম। অক্টোবর মাস শেষ হয়ে আসছে। শীত পড়ি-পড়ি করছে। যথারীতি সকালবেলায় গণেশদার বাড়ির পাশের মাঠে, আর বিকালে নেতাজীর মাঠে আমার প্র্যাকটিস চলল। গণেশদা চটকলে আমার জন্যে একটা চাকরির চেষ্টা করছেন। বোধহয় দু-এক মাসের মধ্যে হয়ে যাবে।

এর মধ্যে একদিন একটা খুশীর ব্যাপার ঘটল। সকালবেলা আমি গণেশদার বাড়ির পাশের মাঠে প্র্যাকটিস করছি একা একা। গণেশদা অফিসে চলে গেছেন। বাঁকা এতক্ষণ ছিল, এইমাত্র চলে গেল। তখন সকাল সাড়ে-ন'টা দশটা হবে। দীপা মাঠে এসে আমাকে টুক করে প্রণাম করল।

আমি অবাক। চোখ তুলে তাকালাম। বললাম, কি হ'লো ব্যাপারটা ?

দীপা তখন লজ্জায় মাথা নীচু করে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অস্ফুট স্বরে বলল, আমি বি. এ. পাস করেছি।

ও, তাই এত খুশী !—আমি কৌতুকের গলায় বললাম, ধ্যুৎ।

দীপা মুখ তুলে বড় বড় চোখ করে বলল, ধ্যুৎ মানে ?

—তুমি করবে বি. এ. পাস ! তা হলেই হয়েছে !

দীপা ঘাড় নেড়ে বলল, শুধু পাস নয় মশাই, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি। সবাই তো আর তোমার মতো পড়াশোনার নামে জুজু দেখে না ! পড়াশোনায় ভালো ছেলে-মেয়েও কিছু থাকে।

আমি হেসে ফেললাম। দীপা বলল, খেলা শেষ করে বাড়িতে এসো। মিষ্টি খাওয়াব।

দীপা যেমন এসেছিল সেভাবে আবার মাঠ ছেড়ে চলে গেল।

আমার সমস্ত মনটা খুশীতে ভরে গেছে। আমি নিজে বি. এ. পাস করলেও এতটা আনন্দ হ'তো না বোধহয় আমার।

॥ চোদ্দো ॥

মাস-দুয়েক পর একদিন গণেশদা বললেন, তোকে একটা দারুণ খবর দেব।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

গণেশদা উত্তেজিত গলায় বললেন, আগামী মাসে কলকাতায় সম্মিলিত ইউরোপীয়ান টীম আসছে। দলে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপের চারজন প্লেয়ার আসছেন। জার্মানীর বেক্‌ন বাউয়ার আসছেন, আসছেন ববি মুর। কলকাতায় তিনটে ম্যাচ খেলবে। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান আর আই. এফ. এ.-র সঙ্গে।

শুনে আমি পাগল। বললাম, গণেশদা, যে করে হোক আমাকে একটা টিকিট যোগাড় করে দাও। ওই খেলা আমাকে দেখতেই হবে।

গণেশদা বললেন, নিশ্চয়ই। তোকে ওদের খেলা দেখতেই হবে। ওদের খেলা থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবি তুই।

জানুয়ারী মাসের ১২ তারিখ বিকেলে ইউরোপীয়ান টীম দমদমে নামল। খেলার ফিক্সচার এই রকম ঃ ১৩ তারিখে মোহনবাগানের সঙ্গে, ১৪ তারিখে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে, ১৫ তারিখে বিশ্রাম। সেদিন ওরা কলকাতার দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখবে। ১৬ তারিখে আই. এফ. এ.-র সঙ্গে খেলা। ১৭ তারিখে ওরা চলে যাবে বম্বে। সেখানে ওরা সম্মিলিত দলের সঙ্গে একটা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে সেদিনই রাতে ফিরে যাবে সিঙ্গাপুরে।

ইউরোপীয়ান দল আসা নিয়ে সমস্ত দেশের ক্রীড়ামোদী মহলে একটা সাড়া পড়ে গেছে। গণেশদা আমার জন্যে একটা টিকিট যোগাড় করলেন।

১৩ ও ১৪ পর পর দুদিন খেলা দেখলাম দু'চোখ ভরে। সত্যি খেলা কাকে বলে তার কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। যেমন গতি, যেমন বোঝাপড়া, তেমন নিখুঁত লক্ষ্যে নাম-ঠিকানা-লেখা পাস।

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল কারুরই কিছু করার ছিল না। সাধ্যমতো প্রতিরোধ দিল ওরা। সুধীর, সুব্রত, গৌতম, পিন্টু, শ্যামল, চিন্ময় আপ্রাণ চেষ্টা করে গেল ওদের আটকাবার। ভালোই খেললো ওরা। উলাগা, সুরজিত, হাবিব, শ্যাম, সুভাষ কয়েকবার বিক্ষিপ্ত আক্রমণ তৈরি করেছিল। কিন্তু হাফ লাইন পেরোতে না পেরোতে সেসব আক্রমণ ভোঁতা!

মোহনবাগান হারল পাঁচ গোলে, ইস্টবেঙ্গল চার গোলে। আরো বেশী গোলে হারাতে পারত ওরা। কিন্তু প্রদর্শনী ম্যাচ তো, দর্শকদের আনন্দ দেওয়াই সেখানে উদ্দেশ্য। তা দর্শকদের প্রাণভরে খেলা দেখাল ওরা। কলকাতা মাঠ এমন খেলা কোনোদিন দেখেনি। ভবিষ্যতে কোনোদিন দেখবে কি না তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

গণেশদা দুটো খেলায় সারাক্ষণ গ্যালারিতে আমার পাশে বসে

উপদেশ দিয়ে গেলেন। ওদের অ্যাটাকিং মুভমেণ্টগুলো কী ধরনের হয়, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। আবার প্রতি-আক্রমণের মুখে ডিফেন্স লাইন কিভাবে নিজেদের সাজিয়ে নেয়, দেখাতে লাগলেন। ফুটবলে গণেশদার অসাধারণ জ্ঞান। চলতি খেলার মাঝে এমন চুলচেরা বিশ্লেষণ আর কেউ করতে পারতেন কি না জানি না।

পরদিন ১৫ তারিখে ভোরবেলা উঠে যথারীতি গণেশদার বাড়ি গেলাম প্র্যাকটিস করতে। গিয়ে শুনি, গণেশদা বাড়ি নেই। সকালে উঠেই বেরিয়ে গেছেন। শুনে গণেশদার উপর অভিমান হ'লো। গণেশদা নিশ্চয়ই কলকাতায় গেছেন ইউরোপীয়ান প্লেয়ারদের সঙ্গে আলাপ করতে। কলকাতার ফুটবল মহলে গণেশদাকে সবাই চেনে, শ্রদ্ধা করে। প্লেয়ারদের সঙ্গে দেখা করতে অসুবিধা হবে না গণেশদার। আমাকে নিয়ে গেলে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হ'তো? আমিও ঐসব বিখ্যাত প্লেয়ারের সঙ্গে মুখোমুখি দু-একটা কথা বলতে পারতাম।

সন্ধ্যে সাতটার সময় আমাদের বাড়িতে এলেন গণেশদা। উত্তেজনায় তখন তাঁর সমস্ত শরীর গনগন করছে। আমাকে বললেন, এক্ষুণি তৈরি হয়ে বেরিয়ে আয়, তোর সঙ্গে অনেক আলোচনা আছে।

আমি বললাম, কী ব্যাপার গণেশদা?

গণেশদা বললেন, কাল আই. এফ. এ. টীমে তুই খেলবি। আজ সারাদিন আই. এফ. এ.-র কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে এলাম।

আমি দপ করে নিভে গেলাম। গণেশদা কী বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

গণেশদা তাড়া দিলেন—আয় তাড়াতাড়ি। ওদের খেলার ছকটা তোকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। ডিফেন্সের কোন্ ফাঁক দিয়ে গোল করতে পারবি সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে তোকে একবার।

খেলা, ছক, গোল—এসব কী বলছেন গণেশদা! আমি অস্ফুট গলায় বললাম, আপনি কি পাগল হয়েছেন গণেশদা? এত বড় বড় প্লেয়ার থাকতে আমি খেলব আই. এফ. এ. টীমে! তাও আবার অত বড় দলের বিরুদ্ধে!

গণেশদা বললেন, অত বড় দলের সঙ্গে খেলবি না তো কার সঙ্গে খেলবি? তোকে আমি আট বছর ধরে সংগোপনে তিল তিল করে তৈরি করেছি কি নেতাজীর হয়ে এঁড়েদায় খেলতে যাওয়ার জন্যে? আর বড় বড় প্লেয়ার তুই কাদের বলছিস? চার গোলে-পাঁচ গোলে হারছে, এরা আবার বড় প্লেয়ার! সেই কথাই আমি আই. এফ. এ.-র কর্তাদের বোঝালাম, 'এমনিতেই তো কাল আপনাদের টীম হারছে তবে একটা নতুন প্লেয়ারকে সুযোগ দেবেন না কেন?' আমি তোর খেলার কথা ওঁদের বুঝিয়ে বললাম। ওঁরা আমাকে চেনেন। জানেন, আমি বাজে কথা বলার লোক নই, তাই শেষ অবধি তোকে নিতে রাজী হয়েছেন।

আমি বললাম, আমি পারব না গণেশদা।

গণেশদা অধৈর্য হয়ে বললেন, এক থাপ্পড় মারব! ···তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আয়। আর হ্যাঁ, শোন, বাড়িতে বলে আয়, আজ রাতে তুই আমাদের বাড়িতে থাকবি। কাল একেবারে খেলার পর বাড়িতে ফিরবি।

আমি মাকে বললাম মা, আমি গণেশদার বাড়ি যাচ্ছি। কাজ আছে। কাল সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরব। চিন্তা কোরো না।

আমি বেরিয়ে আসতে গণেশদা আগে আগে চললেন। আমাদের বস্তির অন্ধকার পথ ভেঙ্গে আমি গণেশদার পেছন পেছন চললাম। যেতে যেতে হঠাৎ ঠকঠক করে কাঁপুনি ধরল আমার। সেটা শীতের, না, ভয়ের, বুঝলাম না।

গণেশদা বাড়িতে গিয়েই কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। আস্তে আস্তে কখন যে আমি গণেশদার কাগজে ডুবে গেছি খেয়াল নেই।

রাত দশটার সময় বৌদির তাড়া খেয়ে চমক ভাঙল আমাদের। তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম আমি।

পরদিন সকালে গণেশদা প্র্যাকটিস করতে দিলেন না। শুধু সামনের মাঠে কয়েক পাক দৌড়ে এলাম। গণেশদা বাজার থেকে মুরগি আনলেন। পাতলা মুরগির ঝোল আর ভাত খেলাম। সঙ্গে সামান্য দই।

বেলা এগারোটা নাগাদ গণেশদা আমাকে নিয়ে বেরোলেন। পথে নেমে আমি বললাম,—গণেশদা, মাকে একবার প্রণাম করে এলে হ'তো না?

গণেশদা থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, ঠিক বলেছিস। তুই যা, বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। আমি স্টেশনে টিকিট কিনে অপেক্ষা করছি।

বেমক্কা একটা প্রণাম পেয়ে যেতে মা অবাক। বললেন, কী ব্যাপার রে?

আমি লাজুক মুখে বললাম, কিছু না, এমনি। কলকাতা যাচ্ছি।

মা বললেন, আয়। দুর্গা দুর্গা!

আমি আবার পথে নামলাম।

॥ পনরো ॥

আমরা সাদা গেঞ্জি পরে মাঠে নামলাম। ওরা লাল গেঞ্জি পরে নেমেছে। আমার গায়ে বাইশ নম্বর গেঞ্জি। গণেশদা সারাক্ষণ আমার পাশে পাশে আছেন।

হঠাৎ একেবারে খেলা শুরু হবার শেষ মুহূর্তে আই. এফ. এ.-র কোচ গণেশদার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, তোর প্লেয়ারকে নিতে পারলাম না রে! এখানকার ব্যাপার আর বলিস না। বিশ্রী সব

দলাদলি। তুই নৈহাটীতে তোর দল নিয়ে বেশ ভালো আছিস। এখানে কোচ স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারে না। সবাই বলছে, 'এতগুলো সিনিয়ার প্লেয়ার ডিঙিয়ে হঠাৎ একটা নাম-না-জানা প্লেয়ারকে দলে নেওয়া হবে না।' তবে দেখি চেষ্টা করে। যদি পারি, হাফ টাইমের পর একবার চেষ্টা করব।

গণেশদা দেখলাম, বেশ দমে গেছেন। আমি বললাম, এ একরকম ভালোই হ'লো গণেশদা। আমি ভালো খেলতে পারতাম না।

অ্যাঁ! —গণেশদা কেমন শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন।

ইডেনে আজ এক লক্ষ দর্শক এসেছে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু মানুষের কালো মাথা। চারদিকের সমস্ত স্ট্যাণ্ড প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। আরো বোধহয় পাঁচ লক্ষ মানুষ আজ রেডিও-টেলিভিশনের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বাঙালী ফুটবলপ্রিয় জাত, আজকের খেলা উপলক্ষ্য করে মানুষ যেভাবে ভেঙ্গে পড়েছে, তা সত্যিই অভূতপূর্ব।

মাঠের মধ্যে এখন ইউরোপীয়ান প্লেয়ারদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাজ্যপালের সঙ্গে। চারপাশে প্রেস-ফটোগ্রাফারদের ভিড়।

কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে চারটেয় খেলা শুরু হ'লো।

টাচ লাইনের পাশে আমি বসে আছি। গায়ে জার্সি অথচ খেলতে পারলাম না। পাশে গণেশদা। চুপচাপ। অন্যপাশে গায়ে জার্সিপরা আই. এফ. এ.-র আরো কিছু প্লেয়ার। আমার মতোই ভাগ্য তাদের। আই. এফ. এ.-র কোচ-কর্মকর্তারাও বসে আছেন টাচ লাইনের পাশে।

খেলা শুরু হতেই গৌতমের পা থেকে বল নিয়ে এগোল হাবিব। বাধা পেতে বল বাড়াল উলাগার পায়ে। আউট লাইন ধরে বল নিয়ে তীব্র গতিতে ছুটল উলাগা। কিন্তু, হাফ লাইনের নীচেই ওদের এগিয়ে-আসা ব্যাক টোকা মেরে বল কেড়ে নিল উলাগার পা থেকে। উলাগাও নাছোড়বান্দা—ব্যাককে বল ক্লিয়ার করতে দেবে না। কাড়াকাড়ির মধ্যে বল আউট লাইন পেরিয়ে গেল।

পাঁচ মিনিটের মাথায় গোল করল রাইট ইন গর্ডাড। বেক্‌ন্‌-বাউয়ারের বাড়ানো বল ধরে পেনাল্টি এরিয়ার দশ গজ আগে থেকে বাঁ পায়ের ভলিতে গোল করল। অসাধারণ প্রতিভার দীপ্তিতে ঝলমলানো একখানা গোল! সমস্ত স্টেডিয়াম আনন্দে মুখর হয়ে উঠল। ওরা আমাদের দেশেরই দর্শক। কিন্তু ওরা জানে, আই. এফ. এ. জিতবে না। তাই ওবা ভালো খেলা দেখতে এসেছে পৃথিবী-বিখ্যাত খেলোয়াড়দের কাছে। প্রত্যাশামতো একটা গোল দেখে ওরা আনন্দে অভিনন্দন জানাল বিদেশী প্লেয়ারদের।

পরমুহূর্তে ববি মুরের একটা শট বার কাঁপিয়ে দিল! তরুণের কিছু করার ছিল না। প্রায় সেণ্টার লাইন থেকে শট নিয়েছিল মুর।

আই. এফ. এ.-র খেলোয়াড়রা গত দুদিনের থেকে আজ বেশ মরিয়া হয়ে খেলছে দেখলাম। অনেক উদ্বুদ্ধ খেলা খেলছে আজ। পরের দশ মিনিট হাবিব, সুরজিত, উলাগা সম্মিলিতভাবে পর পর ক'টা আক্রমণ তৈরি করল। কিন্তু হাফ লাইনের নীচেই সব ক'টা আক্রমণ নষ্ট হ'লো।

বিদেশীদের আজকের খেলা কিছুটা গা-ছাড়া। কিছুটা প্রদর্শনীর মেজাজ। শুধু গোলের ব্যবধানে জেতা নয়, দর্শকদের কিছু ভালো খেলা দেখার অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়া।

হাফ টাইমের আগেই কোচ তিন জন খেলোয়াড় বদলালেন। না, কেউ খারাপ খেলছিল বলে নয়, সবাইকে চান্স দেওয়া আর কি! মাঠে ঢুকল এবার অপেক্ষাকৃত কিছু তরুণ। মিহির, রমেন, প্রসূন। আমাকে ডাকলেন না কোচ। আমি আশাও করি না।

স্টেডিয়াম উল্লাসে ভেঙ্গে পড়ছে মুহুর্মুহু নয়নসুখ খেলা দেখে। ববি একসময় শুধু হাঁটুতে নাচাতে নাচাতে বল নিয়ে গেল পেনাল্টি এরিয়া পর্যন্ত। ভাবা যায় না। নিজেদের হাফ লাইন থেকে বেক্‌ন্‌বাউয়ারের গ্যালারি-করা হাফভলি গোলে তরুণকে প্রায়ই অপ্রস্তুত করে দিচ্ছিল।

আমি ভাবছিলাম, ওরা সত্যি সত্যি যখন জেতার জন্য খেলে

নিজেদের দেশের জন্যে ওয়ার্ল্ড কাপে, তখন না জানি কী খেলা খেলে!

হাফ টাইমের আগে নেহাত করার জন্যে আর একটা গোল করল ওরা। বেকেনবাউয়ার কলকাতার দর্শকদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয়। স্টেডিয়াম জুড়ে আওয়াজ উঠল: 'বেকেনবাউয়ারের গোল চাই।' বেকেনবাউয়ার দর্শকদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করলেন। নিজেদের হাফ লাইন থেকে একাই বল টেনে ঢুকে পড়লেন আমাদের হাফ লাইনে। প্রসূন চমৎকার বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু বেকেনবাউয়ার শুধু গতিতেই পেরিয়ে গেলেন ওকে, তারপর বিদ্যুতের মতো একটা ঝলকানি। তরুণ কিছু বোঝার আগেই বল নেটে। সমস্ত স্টেডিয়াম তখন লাফাচ্ছে।

হাফ টাইম হ'লো।

আর তখুনি মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ল আমার। আই. এফ. এ.-র কোচ আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। বললেন, ওয়র্ম আপ করে নাও, এবার তুমি নামবে।

আমি বিড়বিড় করে বললাম, আমি!

—হ্যাঁ, যাও, তৈরি হয়ে নাও।—বলেই উনি ব্যস্তভাবে ক্লাব হাউসের দিকে চলে গেলেন।

আমি গণেশদার দিকে চাইলাম। গণেশদা তখনও শূন্যদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন। শুকনো ঠোঁট নেড়ে আমাকে যেন কি বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গলা দিয়ে কিছু ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া আর কিছু বেরোল না।

হঠাৎ কি যেন হ'লো আমার। ভীষণ কষ্ট হ'লো আমার। এই লোকটা গত আট বছর আমাকে নিয়ে পড়ে থেকেছে। আমাকে খেলা শিখিয়েছে। আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু লোকটা বদলে কিছু পায়নি। শুধু উজাড় করে আমাকে দিয়েই গেছে। আমি কিছু দিতে পারিনি, দেওয়ার সুযোগও পাইনি। আজ এই চরম পরীক্ষার মুহূর্তে লোকটা আমাকে কিছু বলতে পারছে না, কিছু বলার নেই আর তাঁর। কিছু দেবারও নেই। যা ছিল সব

চুষেপুষে, লুটেপুটে নিয়ে নিয়েছি আমি। আমার সামনে এখন অতীত দিনের এক দুর্ধর্ষ উইঙ্গার বসে নেই, বসে নেই নৈহাটীর এক খেলা-পাগলা কোচ। তার বদলে বসে আছে একজন শেষ-হয়ে-যাওয়া ফুরিয়ে-যাওয়া মানুষ।

আমি চট করে উঠে পড়লাম। ঝট করে গণেশদাকে একটা প্রণাম করে ইডেনের মাটিতে পা দিলাম। শুরু হ'লো আমার ওয়র্ম আপ। সারা মাঠে আমি এখন একা। অন্য প্লেয়াররা এখন সব ড্রেসিংরুমে। মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজছে।

আমি একা একা মাঠ জুড়ে দৌড়োতে লাগলাম। হঠাৎ আমার মতো একজন অজানা-অচেনা ছেলেকে ওয়র্ম আপ করতে দেখে সমস্ত স্টেডিয়াম বেশ অবাক হ'লো। বুঝতে যেন কিছুটা সময় লাগল। তারপর বিদ্রূপে ভেঙ্গে পড়ল ওরা। হো-হো করে চারপাশ থেকে আওয়াজ আসতে লাগল। এর মধ্যে কয়েকটা মন্তব্য কানে আসতে কানে গরম সীসে পড়ল যেন। একটা ঢিল এসে পড়ল পায়ের কাছে। আমি উপেক্ষা করে ওয়র্ম আপ করতে লাগলাম।

হাফ টাইম শেষ।

রেফারী মাঠে এসে গেছেন। খেলোয়াড়রা আস্তে আস্তে মাঠে নামছে। রেফারী বাঁশি বাজিয়ে দু'পক্ষের খেলোয়াড়দের জায়গা নিতে বললেন। আমরা যে-যার জায়গায় দাঁড়ালাম। বাঁ দিকের উইঙ্গার পজিশনে দাঁড়ালাম আমি।

রেফারী বাঁশি বাজালেন।

শুরু হ'লো শেষ অর্ধের প্রদর্শনী খেলা। ইউরোপ সম্মিলিত ভার্সেস ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

সেণ্টার করে মিহির ব্যাক পাস করল গৌতমকে। গৌতম আবার ব্যাক পাস করল চিন্ময়কে। চিন্ময় বল নিয়ে ছুটল। সঙ্গে ছুটছে মিহির, সুরজিত। একটু পিছিয়ে মাঝমাঠ বরাবর আমি।

সুরজিতের পা থেকে বল সাইড লাইন অতিক্রম করে গেল।

থ্রো থেকে বল পেল ওদের ব্যাক। ব্যাক বল নিয়ে কেটে চলে এল হাফে, সেখান থেকে আমাদের হাফ লাইনে বল পেল ওদের রাইট উইঙ্গার গর্ডাড। গৌতম, চিন্ময়, শ্যামল দর্শনীয়ভাবে বাধা তৈরি করছে ওদের সামনে। তারপর কিছুক্ষণ খেলা চলল মাঝমাঠে।

খেলা শুরু হয়ে গেছে দশ মিনিট। আমি এখন অবধি একটাও বল পাইনি। দর্শকদের নজর আর আমার দিকে নেই, খেলার দিকে।

থ্রো-ইন থেকে বল পেল সুব্রত, সুব্রত থেকে প্রসূন। প্রসূন বল পেয়েই টাচ লাইন বরাবর বাড়াল আমাকে। আমি বল ধরতে গিয়ে শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেলাম।

সারা স্টেডিয়াম থেকে হো-হো করে হাসির আওয়াজ উঠল। এক লক্ষ লোকের হাসির শব্দ, একটা অ্যাটম বোম হয়ে ফাটল আমার শরীরে। আমার ঠোঁট শুকিয়ে উঠছে।

থ্রো থেকে ওরা বল পেয়ে সোজা টেনে নিয়ে গেল আমাদের পেনাল্টি এরিয়ার ভেতর। চিন্ময় কর্নার করে বাঁচাল কোনোমতে।

কর্নারের জন্যে বল সাজানো হচ্ছে।

খেলার ১৫ মিনিট কেটে গেছে। কর্নার থেকে হেড করল ওদের স্ট্রাইকার মুলার। তরুণ দারুণ বাঁচাল বলটা। সমস্ত স্টেডিয়াম তরুণকে চেঁচিয়ে অভিনন্দন জানাল।

তরুণ বল উঁচু করে ফেলল হাফ লাইনে। প্রসূন ধরল। প্রসূনকে ঘিরে ওদের তিনজন প্লেয়ার। প্রসূনের ইচ্ছা ছিল বল নিয়ে উঠে আসার। প্রসূনের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। প্রসূন উপায়ান্তর না দেখে বল বাড়াল আমাকে। আমাকে বল বাড়াতেই স্টেডিয়াম থেকে একটা হাসির রোল উঠেছিল মুহূর্তের জন্যে। আমি বল পেয়েই বাঁ পায়ের আড়ালে বল লুকোলাম। ওখানে চুম্বকের মতো বল এঁটে থাকবে, আমি জানি। বল নিয়েই চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেন্টার লাইন ভাঙ্গলাম দ্রুত বিদ্যুতের ছায়ার মতো। সেন্টার লাইনেই বেকেনবাউয়ার—পৃথিবীর সাম্প্রতিক কালের শ্রেষ্ঠ হাফ। আর বাঁ পায়ে বল লুকোনো আমি, নৈহাটীর এঁদো মাঠে খেলা শেখা গণেশদার চেলা।

বেক্‌নবাউয়ারকে প্রথম সুযোগটা দিলাম না আমি। চকিতে হাঁটুর ওপর বল তুলে বেক্‌নবাউয়ারকে পেরিয়ে গেলাম আমি। বেক্‌নবাউয়ার প্রথমটা একটু অপ্রস্তুত, হতচকিত। এভাবে ওঁকে ধোঁকা দিয়ে কেউ বল নিয়ে বেরোবে এটা অপ্রত্যাশিত। আমি জানি, আমার সামনে এখন আর এক থেকে দেড় সেকেণ্ড সময়। নিজের শরীরটা ছিলা-ভাঙ্গা তীরের মতো ছিটকে নিয়ে চলে এলাম হাফ লাইনে। বেক্‌নবাউয়ার তখন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। আমার বাঁ পায়ের লুকানো বলে ততক্ষণে চার্জ শুরু হয়েছে তার। আর ঠিক সেই মুহূর্তে—

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল এগারো নম্বর রিং। গণেশদা সেণ্টার লাইনে বল গড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন, 'এগারো নম্বর।' আর আমি সেই বল নিয়ে পিছলে চলে এসেছি হাফ লাইনে। কিন্তু বেক্‌নবাউয়ার তখন এমনভাবে আমাকে বাঁ দিক থেকে ঘিরে ধরেছেন যে, আমি বাঁ পা খুলতে পারছি না।

এর পরের চার্জেই বেক্‌নবাউয়ার আমার পা থেকে বল কেড়ে নেবেন। আমি বাঁ পায়ের হিল দিয়ে ভেতরে ডান দিকে বল ভাসালাম। এবার ডান পা মুক্ত। আমি আড়াআড়ি আমার শরীরকে ভাসালাম বাতাসে, তারপর ডান পায়ের টো-র চকিত বৈদ্যুতিক উঠানামা···মনে আছে শুধু এগারো নম্বর রিং—রিং একটুও নড়বে না, দুলবে না, শুধু বল গলে যাবে একটা সরু সুতোর মতো।

আমি মাটিতে পড়ে গেলাম।

কী হ'লো?

আট বছরের সমস্ত সাধনা, সমস্ত পরিশ্রম, মুখে-রক্ত-তোলা দাঁতে-দাঁত-চাপা স্বপ্ন শেষ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে গেল?

সমস্ত স্টেডিয়ামে কয়েক মুহূর্তের অসম্ভব নৈঃশব্দ। তারপর হাজার অ্যাটম বোমার মতো ফেটে পড়ল স্টেডিয়াম—গোল! গোল! গোল!

মাটি থেকে তুলে প্রথম অভিনন্দন জানাল আমাকে বেক্‌ন-

বাউয়ার। ওঁর চোখে-মুখে তখন বিস্ময়। হাফ লাইন থেকে এমন অসম্ভব একটা গোল কলকাতার একটা ছেলে করল কী করে!

সুরজিত, সুব্রত, উলাগা আমাকে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল। সমস্ত স্টেডিয়াম তখন সমুদ্রের মতো দুলছে।

কিন্তু আমার ঠোঁট তখনও শুকনো, চোখ খরখরে। একটা লোক আমাকে ভূতের মতো তাড়া করে ফিরছে: 'এই দেখ ছক। বাঁ দিক থেকে আক্রমণ করলে ওদের ডিফেন্স এই ফর্ম নেয়, ভেতর দিক দিয়ে করলে এই ফর্ম।' নিশ্ছিদ্র, অভেদ্য সেই ডিফেন্স লাইন। কিন্তু সেই লোকটা ঘেঁটে বের করে আনে সম্প্রতি-প্রকাশিত বিদেশী জার্নাল। পাতা খুলে দেখায়, ১৯৭৪-এর ওয়ার্ল্ড কাপে চেকোস্লাভিয়ানরা কিভাবে এই প্রাচীর ভেঙ্গেছিল, কিভাবে পুরো ডিফেন্সকে টেনে আনা যায় এক দিকে, কিভাবে ছোট্ট একটা ফাঁক তৈরি করে সহযোগী প্লেয়ারকে দিয়ে গোল করানো যায়।

সাত মিনিট পর আবার গোল। আমাদের হাফ লাইনে খেলা হচ্ছিল। চিন্ময়ের পা ছিটকে একটা আলগা বল পেয়ে গেলাম আমি। আমি বল পেতেই উলাগা, সুরজিত দৌড় শুরু করল।

আমি সাঁ করে পিচ্ছিল পেলবতায় পিছলে এলাম সেণ্টার লাইনে। আমার দু'পায়ের ফাঁকে তখন বল ঘুরছে লাট্টুর মতো। আমার মাথায় তখন একটা ডিফেন্স লাইন ছায়ার মতো দুলছে, ভাসছে, ঠিক যেমন ছবিতে এঁকে দেখিয়েছিলেন একজন।

সেণ্টার লাইন ভাঙ্গতেই ওদের দ্বিতীয় হাফ আমাকে চার্জ করল। বেক্‌নবাউয়ার নেমে গেছেন নীচে। ওঁর নেতৃত্বে দ্রুত ডিফেন্স লাইন তৈরি হচ্ছে। আমি হাফ ভেঙ্গে এবার বিদ্যুতের মতো ভেতরে ঢুকতে শুরু করলাম। আমার কাঁধে কাঁধে সমানে দৌড়াচ্ছে হাফ ব্যাক। আমার বাঁ পা সীল করে রেখেছে। এমনভাবে শোল্ডার-চার্জ করছে যে, যে কোনো মুহূর্তে আমি শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ছিটকে পড়তে পারি মাঠের বাইরে। সমস্ত স্টেডিয়াম উঠে দাঁড়িয়েছে, পিন পড়লে শব্দ হয় বুঝি। হাফ লাইন ভাঙ্গতেই তিনজনের একটা

ডিফেন্স লাইন তৈরি হয়ে গেল আমার চার পাশে। আমার হৃৎপিণ্ড গলায় এসে ঠেকেছে। যে কোনো সময় ভেঙ্গে পড়ব আমি। বাঁ দিকের একজনের মারাত্মক বডি-চার্জে দুলে উঠলাম আমি। কিন্তু বল পা-ছাড়া হয়নি। বাঁ পা থেকে বল নিলাম ডান পায়ে। ডিফেন্স লাইন সরে এলো ডান দিকে। মুহূর্তে ডান পায়ের টোয়ের ঠেলায় বল একটা পিচ্ছিল সাপের মতো উঠে এলো আমার বুকে। বাঁ দিকে ছোট্ট একটা ফাঁক তৈরি হয়েছে। বুকে বল নিয়ে পিছলে বেরিয়ে এলাম ওখান থেকে। সমস্ত ডিফেন্স লাইন ভেঙ্গে পড়েছে। পেনাল্টি এরিয়া আমার আর গোল-পোয়ের মধ্যে। গোলের গন্ধ পাচ্ছি আমি···এখন আমাকে আটকাবে কে···এক লক্ষ ঘোড়া বুকের ভেতর খুর দাপাচ্ছে। বিদ্যুতের মতো চকিতে কে যেন আমাকে বলল, শান্ত হও।

বল নিয়ে সরে এসেছি পেনাল্টি এরিয়ার বাঁ দিকে, সামনে গোল করে দাঁড়িয়ে আছে শীলার, বেকেনবাউয়ার, মুর। ফাঁক নেই। শেষ মুহূর্তে ববি মুর শরীর বাঁকিয়ে আমাকে ফল্‌স দিল, আমি বুঝতে পারলাম না। পেনাল্টি এরিয়ার বাঁ দিকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম আমি—স্টেডিয়াম হা-হা করে উঠেছে—কিন্তু পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে চকিতে দেখতে পেলাম, ডিফেন্স লাইনের বাইরে সুরজিত। ডান পায়ের টোকায় শেষ ইচ্ছা মাখিয়ে বল বাতাসে ভাসিয়ে দিলাম। বল নিখুঁত লক্ষ্যে সুরজিতের পায়ে, ওখান থেকে গোলে বল ঠেলে দিতে সুরজিতের মতো প্লেয়ারের ভুল হ'লো না।

২-২। একটা অসম্ভব, অবাস্তব ঘটনা। ইউরোপীয়ান সম্মিলিত টীমের সঙ্গে আই. এফ. এ.-র ফলাফল ২-২। সমস্ত স্টেডিয়াম যেন চোখ মুছে দেখছে ফলাফলটা। মিলিয়ে নিতে চাইছে, বিশ্বাসের ভেতর ঝালিয়ে নিতে চাইছে।

কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। সুরজিত সেনগুপ্তের গোলে আই. এফ. এ. তখন ২-২ ফলাফলে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু এবার বিদেশী টীমকে রোখাই দায় হ'লো। ওরা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে এসেছিল, এবং জিতবেই জানত। হাফ টাইমের আগেই

দু'গোলে জিতে গিয়ে ওরা খেলাটাকে হালকাভাবে নিয়েছিল। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি। ইউরোপের স্টার ফুটবল টীম কিনা আই. এফ. এ-র সঙ্গে খেলা ড্র করছে!

বঙ্গোপসাগরের গভীর বুকের ভেতর থেকে উঠে এসে সাইক্লোন যেভাবে বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে আছড়ে পড়ে, ওদের আটজন প্লেয়ার সেভাবে আছড়ে পড়ল আমাদের গোলমুখে।

কিন্তু সম্মান ও সাম্যতার গন্ধ পেয়ে আমাদের ডিফেন্স লাইনও তখন মরিয়া। মরে যাব, এখানে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু ঝরে যাবে, কিন্তু জায়গা ছাড়া হবে না। সুব্রত-শ্যামল-রমেন-চিন্ময়-গৌতম-প্রসূনের দল যেভাবে মরিয়া প্রতিরোধের দেওয়াল গড়ে তুলল তা ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ফুটবল যে শুধু একটা খেলাই নয়, খেলার সীমানা ছাড়িয়ে উঠে এসে সে যে কখনো কখনো ধৈর্য, নিষ্ঠা, সংগ্রাম ও মনোবলের চরম প্রদর্শনী হয়ে ওঠে, যাতে করে মানুষের মহত্ব আর একটা নতুন মহত্বের সীমানা ছুঁতে পারে তার চূড়ান্ত নিদর্শন হয়ে উঠল সেই খেলা। শেষ কুড়ি মিনিটের সেই অসম-যুদ্ধের যারা সাক্ষী ছিল সেই এক লক্ষ মানুষ, আর কয়েক লক্ষ শ্রোতা পুলকে, রোমাঞ্চে, শ্রদ্ধায়, সম্মানে বার বার তাদের অভিনন্দন জানিয়েছে, মাথা নীচু করে প্রতিরোধের দেওয়াল গড়ে তোলা সেই ক'জন মানুষের পায়ে।

ওদের সেই লড়াই দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছি আমরাও। আমি, সুরজিত, উলাগা তখন নেমে এসে গৌতম, প্রসূন, চিন্ময়দের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে নেমে পড়েছি। ওদের মরিয়া আক্রমণ তখন বার বার নিষ্ফল আক্রোশে আমাদের দেওয়ালে এসে মাথা খুঁড়ছে। চারটে অব্যর্থ গোল অলৌকিকভাবে বাঁচিয়ে দিল তরুণ।

খেলা শেষ হতে তখনো দু'মিনিট বাকি। আমাদের এগারো জনের তখন শেষ ঘাম ঝরে গেছে ইডেনের ঘাসে। শেষ দু'মিনিটের মরিয়া সংগ্রামের জন্য শরীর নিংড়ে জ্বালানি খুঁজছি। এই সময় ঘটল ব্যাপারটা।

হঠাৎ চিন্ময়ের পা থেকে ছিটকে একটা বল এসে পড়ল সুরজিতের সামনে। আমরা যথারীতি আশা করেছিলাম সুরজিত বল নিয়ে আউটে ফেলবে সময় নষ্ট করার জন্যে। কিন্তু সুরজিতকে চিনতে তখনো আমার কিছু বাকি। সুরজিত পায়ের তীক্ষ্ণ ডজে বল নিয়ে ছুটল বিপক্ষের শিবিরে। সমান স্বপ্ন-বিলাসী উলাগাও। পাশাপাশি মিহির। বল দেওয়া-নেওয়া করে তখন চমৎকার একটা আক্রমণ শুরু করে দিল ওরা আউট দিয়ে। আর ঠিক সেই সময় একটা অলৌকিক শক্তি এসে ভর করল আমার পায়ে। মনে হ'লো, এক লক্ষ ঘোড়া দাপাচ্ছে আমার বুকে, আমি আরো এক-ঘণ্টা দশ মিনিট খেলে যেতে পারি।

সুরজিত তীব্র গতিতে বল নিয়ে ঢুকে পড়ল ওদের হাফ লাইন ভেঙ্গে। ঢুকেই বাঁ দিকে বল দিল উলাগাকে। আমি তখন চকিতে উলাগার সঙ্গে জায়গা বদল করে নিয়েছি। ওদের ডিফেন্স লাইন চোখের নিমেষে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। উলাগা বল পেয়েই শরীরের বাঁকে ওদের লেফট ব্যাককে পেরিয়ে গেল। পেরিয়ে এসেই বল ঠেলল ডানদিকে, কিন্তু বল হঠাৎ গতি হারিয়ে সামনের জমিতে ধপ করে পড়ে জমে গেল। ওদের স্টপার আর রাইট ব্যাক পাশাপাশি, আর পাঁচ গজ দূরে আমি, মাঝখানে এসে পড়ল বলটা। অ্যাড্‌ভান্টেজ ওদের, বল ক্লিয়ার করতে এগিয়ে এলো স্টপার, পেছনের জমির পাহারায় রইল রাইট ব্যাক। আর ঠিক সেই চরম মুহূর্তে আমার মাথায় ঘণ্টা বাজতে লাগল ঢং ঢং করে। ঐ বল পায়ে পাওয়া মানেই জয়, আর জয় মানেই একটা অসম্ভব পাহাড়কে কাত্‌ করে ফেলা। শুধু সামনের ঐ বলটাকে পায়ে পেলেই—ঘণ্টাটা ঢং ঢং করে বাজছে বুকের ভেতরে—আমি ঐ পাঁচ গজ দূর থেকে উড়তে শুরু করলাম, ডান পায়ের টোয়ে বলের নাগালও পেলাম, ওদের স্টপার দুরন্ত শট নিল। আমার পায়ে লেগে বল বাতাসে উড়ে এলো। বাঁ দিকের শোল্ডার দিয়ে স্টপারকে সীল করলাম, তারপর মাথায় বল নিয়ে ঝলসে বেরিয়ে এলাম

রাইট ব্যাকের ডান পাশ দিয়ে। অমন একটা অসম্ভব, অলৌকিক মুভমেণ্ট কী করে সম্ভব হয়েছিল জানি না, কিন্তু হয়েছিল। ডান পায়ের আড়ালে বল নিয়ে আসতেই দেখি, সামনে অবারিত গোল-পোস্ট, গোলকীপার একা।

আমি ডান পায়ের উপরই বল তুললাম গোলে ঠেলার জন্যে। হাতে এক থেকে দেড় সেকেণ্ড সময়। বল বাঁদিকে প্লেস করতে যাচ্ছি, গোলকীপার বাঁ দিকে শরীর বাঁকাল, যেন প্লাস্টিকের শরীর একটা ওর, প্লেস করলেই ধরে নেবে। ডান পায়ের ডগার উপরই বল দুলিয়ে নিয়ে এলাম ডান দিকে, গোলকীপার ডান দিকে শরীর বাঁকাল। যেন মন্ত্র-মুগ্ধ কালকেউটে ফণা তুলে দুলছে, ডান দিকে, না, বাঁ দিকে কোন্ দিকে ছোবল দেবে বুঝতে পারছে না। আমার ডান পায়ের ডগার উপর বল এঁটে আছে চুম্বকের মতো। ডান-পা সরালাম আবার বাঁ দিকে। এবার অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে গোলকীপার বাঁ দিকে ঝাঁপ দিল। আমি বল দুলিয়ে নিয়ে এলাম বাঁ দিকে, সামনে অবারিত মুক্ত গোল। গোল নয়, জয়। জয় নয়, কথা রাখা—সংগ্রাম এবং প্রতিরোধের শেষ এভারেস্ট-বিন্দু। আমি বাঁ দিকে বল ঠেললাম, তারপর পড়ে গেলাম মাটিতে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের তিনজন ডিফেণ্ডার আমার শরীরের উপর এসে ভেঙ্গে পড়ল, ঝড়ের মতো। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে বোধহয় সময় লেগেছিল দেড় সেকেণ্ড।

কারা যেন টেনে তুলল আমাকে মাটি থেকে। বোধহয় আমাদের দলের প্লেয়াররা। আমি ভিড়ের মধ্যে একটা মুখ খুঁজছিলাম, পেলাম না। গোল থেকে তরুণ অবধি দৌড়ে এসেছে, এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। উলাগা, সুরজিত, মিহির, রমেন, সুব্রত, প্রসূন পাগলের মতো ছিনিমিনি খেলছে আমাকে নিয়ে। একটু হাওয়া চাই, হাওয়া! হৃদ্‌পিণ্ড গলায় এসে ঠেকেছে, আর পারছি না! ওদিকে সমস্ত স্ট্যাণ্ড ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। পুলিশ ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। এর মধ্যে দশ-বারো জন বেড়া টপকে মাঠে দৌড়ে

এলো। আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খাচ্ছে মাথায়, কপালে, গালে। একজন এসে আমার বুটের কাছে গড়াগড়ি দিতে শুরু করল। উঃ, আমি বোধহয় মরে যাব! শেষ অবধি বাঁচাল সুরজিত-প্রসূনরা। ওরা আমাকে আগলে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

সেণ্টাব হতেই রেফারী খেলা-শেষের বাঁশি বাজালেন।

৩-২ গোলে জিতলাম আমরা। মনে হ'লো, ঘুমের ভেতর একটা স্বপ্নের খেলা খেলে উঠলাম আমরা এগারোজন।

স্ট্যাণ্ডে স্ট্যাণ্ডে তখন হাজার মশাল জ্বলে উঠেছে। সমস্ত ইডেন মায়াবী আলোয় সেজে উঠেছে। পটকা ফাটছে কানে তালা ধরিয়ে।

ক্লান্ত শরীরটা টেনে কোনোমতে মাঠের বাইরে এলাম। আমাকে ঘিরে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের ভিড়। ঐ ভিড়ের মধ্যে আই. এফ. এ.-র কোচকে দেখলাম। ক্লান্ত গলায় বললাম, গণেশদা কোথায়?

উনি আঙুল তুলে ইশারায় আমাকে দেখালেন গণেশদা সেই টাচ লাইনের পাশে তখনো তেমনি বসে আছেন। সবাই আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসছে। গণেশদা এলেন না। গণেশদা টাচ লাইনের পাশে বসে তখন কাঁদছেন।

॥ ষোলো ॥

গণেশদা ওঁদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে গণেশদা ওঁদের সঙ্গে বাবার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওঁরা তিনজন এসেছেন। এ ঘর থেকে আমি সবাইকে দেখতে পাচ্ছি।

গণেশদা বললেন, ইনিই শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস।

বাবা হাত তুলে নমস্কার করলেন।

গণেশদা বললেন, ইনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট। ইনি ক্লাবের সেক্রেটারী, আর ইনি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল টীমের কোচ।

ওঁরা হাত তুলে বাবাকে নমস্কার করলেন। আমাদের ঘরে আর বসার জায়গা নেই। একটা নড়বড়ে তক্তপোশ, তার উপরই বাবা একটু সরে এসে ওঁদের বললেন, বসুন, এখানে বসুন।

ওঁরা সহজভাবেই বসলেন তক্তপোশের উপর।

বাবা বললেন, আপনাদের আমি কয়েকটা কথা বলব, যদি অপরাধ না নেন।

প্রেসিডেণ্ট বিনীত গলায় বললেন, না, না, বলুন।

বাবা বললেন, কাল এদের মা আমাকে আপনাদের আসার কথা বলে আমাকে বাড়ি থাকতে বলেছিল। আমি প্রথমটায় রাজী হইনি। কাজ কামাই করে ঘরে বসে থাকা আমাদের পোষায় না। আমি প্রেসের কম্পোজিটর। এক দিন কাজে না গেলে আমার সাত টাকা কাটা যায়। এমনিতেই সংসার চলতে চায় না, তার উপর সাত টাকা কাটা যাওয়া মানে বুঝতেই পারছেন!

প্রেসিডেণ্ট নীরবে টাক চুলকে নিলেন।

--শুনলাম, আমার ছেলের খেলার ব্যাপারে আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি আমার ছেলের খেলার ব্যাপারে অত্যন্ত বিরক্ত। কিন্তু অন্য বিষয়ে কয়েকটা কথা বলার জন্যে আমি আজ বাড়িতে থেকে গেলাম।

বাবা এবার একটু থামলেন, দম নিলেন, তারপর বললেন, দেখুন, আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে, আপনারা সবাই শিক্ষিত, ভদ্র, অভিজাত। কিন্তু এটা কি আপনাদের উচিত হচ্ছে? আমার ছেলেকে খেলার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে আপনারা আমার সংসারের সর্বনাশ করছেন কেন? গরীবদের কি ওসব ঘোড়ারোগ পোষায়? আমার ছেলে যদি খেলে সময় নষ্ট না করে মন দিয়ে পড়াশুনা করে বি. এ. পাস করত, তবে হয়তো একটা চাকরি জোটাতে পারত। তাতে আমার সংসারের কিছুটা সুসার হ'তো। আপনারা শিক্ষিত ভদ্রলোক, আপনাদের এই সহজ ব্যাপারটা বোঝা উচিত বলে আমি মনে করি।

বাবা থামলেন। শেষের দিকে বাবার গলায় কিছুটা ক্ষোভ আর

উষ্মা ছিল। ঘরে কিছুক্ষণের জন্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।

কিছুক্ষণ পর প্রেসিডেন্ট সেই নীরবতা ভাঙ্গলেন! বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন দাসমশাই। কিন্তু আপনার ছেলের কথা আলাদা। সে প্রতিভাবান, সে অসাধারণ খেলোয়াড়। দেশের গর্ব সে। খেলতে গিয়ে সে সময় নষ্ট করেনি, বরং—

বাবা তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে বললেন, বুঝলাম, আমার ছেলে প্রতিভাবান, কিন্তু তাতে আমাদের মতো গরীবের কি কোনো সুসার হবে?

ক্লাবের সেক্রেটারী কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে প্রেসিডেন্ট বললেন, আমরা আপনার ছেলেকে এই বছর আমাদের ক্লাবে খেলার জন্যে আপনার অনুমতি চাইতে এসেছি। আপনি অনুমতি দিলে আমরা কণ্ট্রাক্ট সই করব।

প্রেসিডেন্ট কিছুক্ষণ থামলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আপনার ছেলের প্রতিভার মূল্য দেওয়া আমাদের দেশের ক্লাবের পক্ষে সম্ভব নয়, আমরা জানি। বিদেশী যে টীম কিছু দিন আগে এখানে খেলতে এসেছিল তার ম্যানেজার আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। তারা অনেক টাকা দিয়ে আপনার ছেলেকে তাদের ক্লাবে খেলবার জন্যে কিনে নিতে চায়। কিন্তু আমরা চাই না ওর মতো খেলোয়াড় দেশের বাইরে চলে যাক। আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতায় ওকে দেশেই রেখে দিতে চাই।

প্রেসিডেন্ট এবার সেক্রেটারীকে ইশারা করতে তিনি অ্যাটাচি ব্যাগ খুলে কণ্ট্রাক্ট ফর্ম বের করলেন। প্রেসিডেন্ট কণ্ট্রাক্ট ফর্ম হাতে নিয়ে বললেন, আমরা এই বছর আমাদের ক্লাবে আপনার ছেলেকে খেলার জন্যে পঁচানব্বই হাজার টাকা দেব। এ ছাড়া আগামী দশ বছরের জন্য ওর খেলা আমরা তিন লাখ টাকায় ইন্‌সিওর্ করে দেব। সমস্ত খরচ আমাদের ক্লাবের। দশ বছরের মধ্যে কোনো দুর্ঘটনায় যদি ও খেলতে না পারে, তবে টাকাটা ও পাবে। কলকাতার আরো দু-একটা ক্লাব হয়তো আমাদের চেয়েও বেশি টাকায় আপনার ছেলেকে তাদের ক্লাবে পেতে চাইবে। কিন্তু ওর কোচ গণেশদার ইচ্ছা, ও এই বছরটা অন্তত আমাদের ক্লাবে খেলুক। সেই জোরেই আমাদের আপনার অনুমতি চাইতে আসার সাহস।

বাবা বোধহয় এতক্ষণের এতসব কথার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারেননি। কেমন অর্থহীন গলায় বললেন, পঁচানব্বই হাজার টাকা!

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সেক্রেটারী বললেন, শুধু এই বছরটা খেলার জন্যে।

বাবা বললেন, খেলে এত টাকা·····

উনি বললেন, দিন পাল্টাচ্ছে মিঃ দাস। আজকাল আমাদের দেশে খেলাধূলা আর অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। খেলাধুলোর সত্যিকার প্রতিভাকে নষ্ট না করে উৎসাহ দেওয়া উচিত। অথচ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কত অভিভাবক ছেলেদের নিরুৎসাহ করে অঙ্কুরেই প্রতিভা নষ্ট করে দেন! তা না হলে এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না যে, এত বড় দেশে একটাও ছেলে নেই অলিম্পিকে দেশের জন্যে যে একটাও সোনা আনতে পারে।

প্রেসিডেণ্ট বললেন, এবার যদি আপনার ছেলেকে ডাকেন····· আর এই নিন টাকার চেক। চেকটা আপনার নামেই দিলাম।

এতক্ষণে যেন গণেশদার হুঁশ হ'লো, হৈ-হৈ করে উঠলেন—হ্যাঁ তাইতো, যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, সেই ছোকরা কোথায়?

গণেশদা আমাব নাম ধরে চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন।

দীপা তখন চা নিয়ে ওঘরে ঢুকছিল। থমকে দাঁড়িয়ে বলল, কি হ'লো, তোমাকে গণেশদা ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছ না?

আমি পায়ে-পায়ে ওঘরে ঢুকলাম। গণেশদা বললেন, নে, কণ্ট্রাক্ট ফর্মে সই কর্। দাঁড়া দাঁড়া, সই করার আগে বাবাকে প্রণাম করে নে।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। গণেশদা তাড়া দিলেন—কি হ'লো, যা, বাবাকে প্রণাম কর।

আমার সমস্ত শরীর ভারি হয়ে আসছিল। কোনো কথা বুঝতে পারছিলাম না। আমি সামনে গণেশদার নিরাভরণ পা দু'টো দেখে ঝপ করে সেখানেই প্রণাম করে ফেললাম।

গণেশদা ব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে আরে, এখানে নয়, ওখানে—ওখানে!

গণেশদা হাত ধরে আমাকে তুললেন। আমি গণেশদাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেললাম।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট আর কোচ তখন তক্তপোশের উপর বসে মিটমিট করে হাসছেন।

★